The Jahangirnagar Review, Part-C, Vol. XXXV, No. 2, pp 33 - 73
ISSN 2306-3920

সেলিম আল দীন-এর কথানাট্য *চাকা* : মঞ্চে ও চলচ্চিত্রে

ফাহমিদা আক্তার*

[**সার-সংক্ষেপ :** এ প্রবন্ধ দুই ভিন্ন শিল্প মাধ্যম – মঞ্চ ও চলচ্চিত্রে সেলিম আল দীন রচিত কথানাট্য *চাকা*-এর শিল্পরূপ আর অভিঘাতের স্বরূপ ও স্বাতন্ত্র্য অনুসন্ধানে প্রত্যয়ী। নাটক রচনায় সেলিম আল দীন ক্রমেই অনুসন্ধিৎসু হয়েছিলেন দেশজ শিল্প আঙ্গিকের নবতর রূপ সৃজনে। *চাকা* নাটকের গঠন শৈলীতেও আমরা লক্ষ্য করি তাঁর শেকড়মুখী প্রবণতায় তিনি নিবিষ্ট থেকেছেন ঐতিহ্যবাহী বাংলা নাট্যের নবতর নির্মাণে। 'দ্বৈতাদ্বৈতবাদী' শিল্পতত্ত্বের প্রেরণায় এ নাটকে তিনি সংযোগ ঘটিয়েছেন সংগীত, কাব্য, গল্প, উপন্যাস, কথকতা আর চিত্রকলার দ্যোতনাসহ নানা আঙ্গিকের পরোক্ষ কিংবা প্রত্যক্ষ প্রভাব। তবে এর মূল বিষয়ে মুখ্য করেননি পুরাণ কিংবা লোককথা উদ্ধৃত বিষয় সরাসরি। এ নাটকে বর্ণিত হয়েছে ৯০-এর গণআন্দোলনের প্রেক্ষাপটে নিহত একটি ঠিকানা না পাওয়া লাশের সৎকারে অনাত্মীয় এক গাড়োয়ান ও তার সঙ্গীদের মানবিকতার গল্প। বাংলাদেশে সেলিম আল দীনের *চাকা*কে প্রথম মঞ্চে এনেছিল ঢাকা থিয়েটার **১৯৯১** সালে – এর নির্দেশনায় ছিলেন সৈয়দ জামিল আহমেদ। পরবর্তী সময়ে – **১৯৯৩** সালে, চলচ্চিত্র পরিচালক মোরশেদুল ইসলাম নির্মাণ করেন একই শিরোনামের চলচ্চিত্র *চাকা* এই নাটক অবলম্বনে। দুটো প্রযোজনাই প্রশংসিত হয় সুধী মহলে। তবে একই নাটকের বিষয়কে কেন্দ্র করে উপস্থাপনা সত্ত্বেও, এই নাট্যপ্রযোজনা ও চলচ্চিত্রের শিল্প ভাবনা এবং দর্শক অভিঘাতে রয়েছে ভিন্নতা ও স্বাতন্ত্র্য। এই প্রবন্ধ, একই সাথে নাট্যতত্ত্ব ও চলচ্চিত্র গবেষণার সংশ্লিষ্ট রীতি পদ্ধতি প্রয়োগ পূর্বক এই দুই আঙ্গিকে *চাকা*র গবেষণাধর্মী বিশ্লেষণ উপস্থাপনে সংকল্পবদ্ধ। এতে উঠে আসবে সেলিম আল দীনের *চাকা*র মঞ্চ ও চলচ্চিত্র পরিভ্রমণের গতিরেখ, শিল্পভঙ্গি আর অভিঘাতের বিশ্লেষণধর্মী পর্যালোচনা।]

ভূমিকা

চলচ্চিত্র ও থিয়েটার দুটোই শ্রব্য ও দৃশ্যনির্ভর শিল্প মাধ্যম। দুটোকেই আমরা উপস্থাপনা শিল্প (presentational art) বলতে পারি। তা সত্ত্বেও এ দুয়ের নির্মাণ-কৌশল, উপকরণ, শিল্পভঙ্গি ও অভিঘাত ভিন্ন। একটি ধারণকৃত মাধ্যম (recorded medium), অন্যটি জীবন্ত (live medium)। তাৎক্ষণিকভাবে সৃষ্টি হয় বলে দর্শকের ওপর থিয়েটারের প্রভাব ব্যাপক। আবার অন্য অর্থে, থিয়েটারের প্রভাব ক্ষণস্থায়ীও বটে, অন্তত চলচ্চিত্রের তুলনায়। কারণ চলচ্চিত্রকে ধারণ করা হয় বলে, এটি কালের বিবর্তনে অপরিবর্তনীয় রূপে পরিবেশিত হওয়ার সক্ষমতা রাখে। যদিও ভিন্ন সময়ের দর্শকের কাছে তা ভিন্ন প্রণোদনা সৃষ্টি করে দর্শকের অভিজ্ঞতা ও জীবনবোধের আলোকে। সুতরাং

---

* **ড. ফাহমিদা আক্তার :** অধ্যাপক, নাটক ও নাট্যতত্ত্ব বিভাগ, জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়, **E-mail :** fahmida.akhter@juniv.edu

চলচ্চিত্র মাধ্যটির রয়েছে এক ধরনের দীর্ঘস্থায়িত্ব, অন্তত সংরক্ষণের দিক থেকে। সংরক্ষণ আর শিল্প প্রকরণের ভিন্নতা সত্ত্বেও এই দুই মাধ্যমই কিন্তু **গল্প** বলে। দুটোই মানব জীবনের নানা পরিস্থিতিকে তুলে ধরে – দুটোর উদ্দেশ্যই মহৎ। দুটোই সৃষ্টিশীলতার মাধ্যমে জীবনের যে শিল্পিত উপস্থাপনা হাজির করে, তা সমাজ ও সভ্যতার অগ্রগতি ও বিকাশের সহায়ক। তবে এদের গল্প কথনের ভাষায় রয়েছে স্বাতন্ত্র্য। চলচ্চিত্র দৃশ্য ও শব্দের মেলবন্ধনে সৃষ্ট একটি চিত্রকল্পনির্ভর শিল্প – এ শিল্পের প্রকাশে শব্দ, সংগীত, শব্দহীনতা, চিত্র, অসংখ্য চিত্রের যোজনা ও বিন্যাস ইত্যাদি গুরুত্বপূর্ণ। চলচ্চিত্রে ক্যামেরার চোখ দিয়ে সবকিছু দেখা হয় বলে এখানে অতি নাটকীয়তার স্থান নেই। অন্যদিকে, থিয়েটারেও শ্রব্য ও দৃশ্যের সমবায় ঘটে। তবে এতে অভিনেতা-অভিনেত্রীদের ক্রিয়া ও দর্শক সংযোগের বিষয়টি গুরুত্বপূর্ণ। দর্শকাসনের সামনের ও পেছনের সারির দর্শকের সাথে সমানভাবে সংযোগ স্থাপন করতে গিয়ে থিয়েটারের অভিনয়কে হতে হয় বাস্তবের চাইতেও কিছুটা অতিরঞ্জিত।

থিয়েটার ও চলচ্চিত্রের কিছু পার্থক্য ওপরে তুলে ধরা হলো, এই প্রবন্ধের আধেয় বিষয় এবং বিষয়ের প্রয়োজনীয়তা অনুধাবনের লক্ষ্যে। এই প্রবন্ধ বাংলা নাটকের কালোত্তীর্ণ স্রষ্টা নাট্যাচার্য সেলিম আল দীন রচিত কথানাটক *চাকা*-এর মঞ্চরূপ ও চলচ্চিত্ররূপের শিল্পভঙ্গির স্বরূপ ও তুলনামূলক পর্যবেক্ষণ অনুসন্ধানে প্রত্যয়ী। সেলিম আল দীনের *চাকা*কে মঞ্চে এনেছে ঢাকা থিয়েটার ১৯৯১ সালে – নাট্য প্রযোজনাটির নির্দেশনায় ছিলেন সৈয়দ জামিল আহমেদ। শিল্পসৃষ্টিতে সেলিম আল দীন ছিলেন সকল শিল্পতীর্থমুখী। তাঁর এই কথানাট্য রচনায় আমরা দেখি প্রচলিত নাটকের রীতিকে তিনি ভাঙ্গতে চেয়েছেন 'দ্বৈতাদ্বৈতবাদী'[১] শিল্পতত্ত্বের প্রেরণায়। এ কারণেই এতে কিস্‌সা কথন রীতি যেমন আছে, তেমনি আছে কাব্য ও সংগীতের মিশেলে সৃষ্ট এক অপূর্ব গীতলতার দোলা। কথার শাসনের রচিত সেলিম আল দীনের এই কথানাট্যকে[২] মঞ্চে আনতে গিয়ে সৈয়দ জামিল আহমেদ অধিকাংশ ক্ষেত্রেই সচেষ্ট থেকেছেন সেলিম আল দীনের শিল্পভঙ্গির প্রতি বিশ্বস্ত থেকে এর বর্ণনাধর্মী প্রবণতাগুলো তুলে আনার লক্ষ্যে। দৃশ্যনির্মাণেও বস্তুর প্রতিরূপ গড়ার প্রচেষ্টা উপেক্ষিত হয়েছে ইঙ্গিত নির্মাণের কৌশলে, যার আবেদন দর্শকের কল্পনাশক্তির কাছে। আবার বিষয়ের দিক থেকেও *চাকা* নাটকের যে মানবিক দিক – তাও উঠে আসে সৈয়দ জামিল আহমেদ-এর প্রযোজনায় আঙ্গিকের সমান গুরুত্ব নিয়ে। সেলিম আল দীনের এই নাটকের মূল বিষয়কে নিয়ে পরবর্তী সময়ে, অর্থাৎ ১৯৯৩ সালে, চলচ্চিত্র পরিচালক মোরশেদুল ইসলাম নির্মাণ করেন একই শিরোনামের চলচ্চিত্র *চাকা*। নাটকের মতোই এই চলচ্চিত্রের মূল কাহিনি আবর্তিত হয়েছে একটি লাশকে তার ঠিকানায় পৌঁছে দেবার লক্ষ্যে – দুই গাড়োয়ানের (লাশটিসহ) গরুর গাড়িতে করে নানা গ্রামময় গমন আর লাশের ঠিকানা অনুসন্ধানকে ঘিরে।

---

১. 'দ্বৈতাদ্বৈতবাদী' শিল্পতত্ত্ব সেলিম আল দীন সমর্থিত এক প্রাচ্যদেশীয় শিল্পতত্ত্ব যার মূল প্রবণতাটি তিনি গ্রহণ করেছিলে চৈতন্যদেব-এর 'অচিন্ত্যদ্বৈতাদ্বৈতবাদ' থেকে। এই শিল্পতত্ত্বে একের ভেতর বহু এবং বহুর মধ্যে একের লীন হবার প্রেরণাটি মূল শক্তি হিসেবে কাজ করে। প্রসঙ্গক্রমে পাঁচালির উদাহরণ দেওয়া যায়। পাঁচালিতে একই সাথে নাট্য, নৃত্য, গীত, কথা, কৃত্য, কাহিনি, উপাখ্যানসহ নানা উপাদানের সংযোজন ঘটেছে। এক হয়েও সে বহুর সৌন্দর্যে উদ্ভাসিত। 'দ্বৈতাদ্বৈতবাদী' শিল্পতত্ত্ব বিষয়ক সেলিম আল দীনের ব্যাখ্যা ও পর্যবেক্ষণ তাঁর নানা রচনায় লভ্য হলেও নিচের রচনায় তা দৃঢ় নিবদ্ধ দৃষ্টিকোণ সমেত উপস্থিত:

- সেলিম আল দীন। "বাঙলা দ্বৈতাদ্বৈতবাদী শিল্পতত্ত্বের পূর্বাপর"। *থিয়েটার স্টাডিজ*, সংখ্যা ৩, নাটক ও নাট্যতত্ত্ব বিভাগ, জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়, জুন, ১৯৯৫: ৭–৪০।

২. কথানাট্য প্রসঙ্গে সেলিম আল দীন বলেন: "বলতে বলতে নাটক, সেজন্যই কথানাট্য।"

- সেলিম আল দীন, *চাকা*, "কথাপুচ্ছ" (ঢাকা: গ্রন্থিক, ১৯৯১), পৃ. ৪৩।

শেষপর্যন্ত, লাশটির সাথে গাড়োয়ানদ্বয়ের এক মানবিক সম্পর্ক যেন স্থাপিত হয় – যে কারণে কোনো ঠিকানা না পাওয়া অজানা লাশটিকে ওরাই কবরস্থ করে। লাশটি দাফনের পর, আপন মানুষ হারানোর ব্যাথায় ওদের চোখ অশ্রুশিক্ত হয়। মোরশেদুল ইসলামের *চাকায়* গীতলতা থাকলেও তাতে আছে এক ধরনের কথাহীনতা, যা সেলিম আল দীনের কথানাট্যের মতো কথামুখর নয়। সংলাপের চাইতেও ঘটনা এগিয়েছে এতে দৃশ্য, ক্রিয়া ও পারিপার্শ্বিক শব্দের যোজনে। তবে দৃশ্য নির্মাণে, এ চলচ্চিত্রে বাস্তবতার প্রতীতি সৃষ্টির প্রচেষ্টা স্পষ্ট। আবার দৃশ্যের সাথে সংশ্লিষ্ট ভাবোদ্দীপক আবহ সংগীত বা গানের ব্যবহারে মেলোড্রামার সুরটিও দুর্লক্ষ্য নয়। মোরশেদুল ইসলামের এই চলচ্চিত্রকে অনেক গবেষক সমালোচনা করেছেন, সেলিম আল দীনের নাট্যভাষার বর্ণনাধর্মী ব্যাপ্তিকে তুলে না আনার কারণে।[৩] কেউ দেখেছেন একে ধীর লয়ের আর নিচু পর্দার চলচ্চিত্র হিসেবে, তবে এ শ্লথতা বিষয়ের সাথে সঙ্গতিপূর্ণ।[৪] উল্লেখ্য, এই চলচ্চিত্র বহির্বিশ্বে সমাদৃত হয়েছে, এর গল্প বলার ঢঙ আর নির্মিতির নিরীক্ষাপ্রবণতার কারণে।

বক্ষ্যমান প্রবন্ধ প্রত্যয়ী এই একই নাটকের কাহিনির দুই ভিন্ন শিল্প মাধ্যম – মঞ্চ ও চলচ্চিত্রে প্রযুক্ত শিল্পরূপ আর অভিঘাতের স্বরূপ ও স্বাতন্ত্র্য অনুসন্ধানে। সেলিম আল দীনের *চাকা* মঞ্চে ও চলচ্চিত্রে দুই ভিন্নরূপেই উপস্থাপিত হওয়া স্বাভাবিক – এই দুই মাধ্যমের ভিন্নতার কারণেই, যা উপরে অল্প-বিস্তর আলোচনা করা হয়েছে। এ ছাড়া একজন পরিচালক নিজেও একজন সৃষ্টিশীল ব্যক্তিত্ব। সুতরাং মূল গল্পের স্রষ্টার শিল্পভাবনাকে নিজ শিল্পরসে তিনি জারিত করবেন, এটাই স্বাভাবিক। উল্লেখ্য, সংশ্লিষ্ট চলচ্চিত্র ও নাট্যপ্রযোজনাকে ঘিরে স্বতন্ত্রভাবে ইতিপূর্বে বিভিন্ন আয়তনের সমালোচনাধর্মী লেখা সম্পন্ন হলেও, এই দুয়ের তুলনামূলক ও গবেষণাধর্মী লেখার তেমন সন্ধান পাওয়া যায় না। এই প্রবন্ধ, একই সাথে নাট্যতত্ত্ব ও চলচ্চিত্র গবেষণার সংশ্লিষ্ট রীতি পদ্ধতি প্রয়োগ পূর্বক এই দুই আঙ্গিকে *চাকার* গবেষণাধর্মী বিশ্লেষণ উপস্থাপন করবে, যা একই সাথে নাটক ও চলচ্চিত্র সংশ্লিষ্ট গবেষণা ও অধ্যয়নের জন্য গুরুত্বপূর্ণ ও প্রয়োজনীয় হবে বলেই প্রত্যাশা করি। সর্বোপরি, সেলিম আল দীনের *চাকার* মঞ্চ ও চলচ্চিত্র পরিভ্রমণের গতিরেখ, শিল্পভঙ্গি আর অভিঘাত অনুসন্ধানের এই প্রবন্ধ – থিয়েটার ও চলচ্চিত্র প্রযোজনার স্বরূপ অন্বেষণে যেমন প্রয়োজনীয় ভূমিকা রাখবে, তেমনি উপযোগী হবে এই দুই মাধ্যমের পারস্পরিক সম্পর্ক অনুধাবনে।

প্রবন্ধের ক্রম পর্যায় ও অনুসৃত পদ্ধতি

এই রচনায় নাট্যপ্রযোজনা অধ্যয়ন ও চলচ্চিত্র গবেষণায় প্রযুক্ত নানা গুণগত গবেষণা পদ্ধতির প্রয়োগ সম্পন্ন হয়েছে। তবে এই দুই মাধ্যমে অর্থাৎ থিয়েটার ও চলচ্চিত্রে সেলিম আল দীন সৃষ্ট *চাকার*

---

৩. নাটক ও নাট্যতত্ত্ব বিষয়ের শিক্ষক ও গবেষক লুৎফর রহমানের মতে: "*চাকা* চিত্রনাট্য [...] কাঙ্ক্ষিত উচ্চতাকে স্পর্শ করতে পারেনি – সে কারণেই নাটক পাঠান্তে নির্মিত চলচ্চিত্র দৃষ্টে *চাকাকে* মনে হয় স্নেহময়ী জননীর অনাদরে লালিত সন্তান।"

– লুৎফর রহমান। "*চাকা* নাটক ও চিত্রনাট্য: একটি তুলনামূলক বিচার"। *থিয়েটার স্টাডিজ*, সংখ্যা ১৫, নাটক ও নাট্যতত্ত্ব বিভাগ, জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়, ২০০৮, জুন, পৃ. ৫৭।

৪. বাংলাদেশের পুরোধা শিক্ষাবিদ ও অনুবাদক কবির চৌধুরী *চাকা* চলচ্চিত্র সম্পর্কে বলেন: "মাঝে মাঝে মনে হতে পারে যে [চলচ্চিত্রটি] বড় ধীরগতি[র], একটু এক ঘেয়ে। কিন্তু তা বিষয়বস্তু বা থিমের মধ্যে সামঞ্জস্যপূর্ণ মন্থরতা [...]"

– কবির চৌধুরী। "মোরশেদুল ইসলামের 'চাকা' "। *মোরশেদুল ইসলামের চলচ্চিত্র: প্রসঙ্গ আগামী ও চাকা*। হেমন্ত সাদীক (সম্পাদিত)। (ঢাকা: চলচ্চিত্রম ফিল্ম সোসাইটি, ২০১৯)। পৃ. ৯।

শিল্পপ্রয়োগ ও স্বাতন্ত্র্য অনুসন্ধানের পূর্বেই বিশেষভাবে সম্পন্ন করা হয়েছে মূল নাটকের পাঠ। সেখানে নাটকের বিষয় ও আঙ্গিক দুটোর অনুসন্ধানই গুরুত্ব পেয়েছে বিশেষভাবে। এরপর মঞ্চ ও চলচ্চিত্র মাধ্যমে এই নাটকের বিভিন্ন প্রযোজনার পরিসংখ্যান যেমন অনুসন্ধান করা হয়েছে, তেমনি বিশেষভাবে ঢাকা থিয়েটারের *চাকা* (১৯৯১) মঞ্চ প্রযোজনা ও মোরশেদুল ইসলামের *চাকা* (১৯৯৩) চলচ্চিত্র প্রযোজনার করণকৌশল ও শিল্পভঙ্গি অনুসন্ধান ও বিশ্লেষণ করা হয়েছে।

ঢাকা থিয়েটারের *চাকা* নাট্যপ্রযোজনাটি যেহেতু ভিডিওতে ধারণ করা হয়নি কিংবা বর্তমান সময়ে এই প্রযোজনা মঞ্চে আর উপস্থাপিত হচ্ছে না, সেক্ষেত্রে বিভিন্ন আর্কাইভ উপকরণ সংগ্রহ আর সাক্ষাৎকারের ভিত্তিতে প্রযোজনা সংক্রান্ত নানা তথ্য ও উপাত্ত সংগ্রহ করা হয়েছে। এ ছাড়াও অত্র প্রবন্ধ রচয়িতার সেই সময়ে নাট্যপ্রযোজনা অবলোকনের ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতাও সহায়ক হয়েছে এর বিশেষ অধ্যয়ন ও বিশ্লেষণে। নাট্য প্রযোজনাটির আর্কাইভ উপকরণের মাঝে রয়েছ প্রযোজনার বিভিন্ন স্থিরচিত্র, পোস্টার, প্রচার পত্র, নাট্যপ্রযোজনার ভূমিচিত্র আর পূর্বে লেখা বিভিন্ন প্রবন্ধ-নিবন্ধ। এ ছাড়াও সাক্ষাৎকারের ভিত্তিতে এই প্রযোজনার বিভিন্ন কুশলী ও অভিনেতা-অভিনেত্রীদের কাছ থেকে তাঁদের সংশ্লিষ্ট অভিজ্ঞতার তথ্য ও বিভিন্ন উপকরণ সংগ্রহ করা হয়েছে। নাট্য প্রযোজনাটির পরিচালক সৈয়দ জামিল আহমেদ-এর সাক্ষাৎকার গ্রহণ সম্ভব হয়নি তাঁর ব্যস্ততার কারণে। তবে এ নাট্যপ্রযোজনা নির্মাণে তাঁর কর্মপদ্ধতি ও দার্শনিক অভিপ্রায় নিয়ে সম্পন্ন একটি গবেষণা প্রবন্ধ (আহমেদ, ২০২২: ১৩-৫৬) সংগ্রহ ও অধ্যয়ন করা হয়েছে – এর উদ্দেশ্য প্রায় ৩৩ বছর আগে সম্পন্ন এই প্রযোজনার নানা তথ্য ও তত্ত্ব সংগ্রহ। সবমিলিয়ে প্রযোজনার বিভিন্ন কারিগরি দিক, দর্শনগত অভিপ্রায়, প্রযুক্ত রীতি এবং অভিনয় উপস্থাপনা বিশ্লেষণ করা হয়েছে গুণগত পদ্ধতিতে। তবে প্রযোজনা সংশ্লিষ্ট সার্বিক বিশ্লেষণে প্রবন্ধ রচয়িতার স্বীয় পর্যবেক্ষণও গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখেছে উপরে উল্লিখিত উপায়ে প্রাপ্ত তথ্য-উপাত্তের ভিত্তিতে।

চাকা (১৯৯৩) চলচ্চিত্রটির বিশ্লেষণের ক্ষেত্রে চলচ্চিত্রের নানা দিক, যেমন চিত্রগ্রহণ, সংগীত, সংলাপ, আলো, সম্পাদনাসহ মিঁজ-অন-সিন[৫]-এর বিশেষ পাঠ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখেছে। *চাকা* চলচ্চিত্রটি যেহেতু চলচ্চিত্ররূপে সংরক্ষিত আছে, সেহেতু এর বিশ্লেষণের ক্ষেত্রে নাট্যপ্রযোজনার মতো নানা কুশীলব বা কুশলীদের বিস্তারিত সাক্ষাৎকার গ্রহণের প্রয়োজন হয়নি। তবে তাঁদের লেখা নানা প্রবন্ধ সংগ্রহের ভিত্তিতে এই চলচ্চিত্রে তাঁদের অংশগ্রহণের অভিজ্ঞতা ও চলচ্চিত্রটিকে ঘিরে তাঁদের পর্যক্ষেণ/মূল্যায়ন প্রসঙ্গে অবগত হওয়া সম্ভবপর হয়েছে। প্রবন্ধ রচয়িতার সাথে চলচ্চিত্র পরিচালকের পূর্বে সাধিত একাধিক সাক্ষাৎকার সহজতর করেছে প্রযোজনা সংক্রান্ত বিভিন্ন তথ্য প্রাপ্তি, এবং তাঁর কাজের ধারা সম্পর্কিত তথ্য সংগ্রহ ও অনুধাবনে। উল্লেখ্য, এক্ষেত্রেও অর্থাৎ চলচ্চিত্রের নিবিড় পাঠ ও বিশ্লেষণে, প্রবন্ধ রচয়িতার পর্যবেক্ষণ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখেছে – চলচ্চিত্রটির বিশেষ অবলোকনের মধ্য দিয়ে। তবে চলচ্চিত্র গবেষণার গুণগত রীতির (Qualitative method) অনুসরণে চলচ্চিত্রটির পদ্ধতিগত বিশ্লেষণ করা হয়েছে। সেলিম আল দীনের *চাকা* নাটকের নাট্যপ্রযোজনা এবং এ নাট্যকাহিনিকে ঘিরে নির্মিত চলচ্চিত্র প্রযোজনার তুলনামূলক পর্যবেক্ষণও অন্তর্ভুক্ত হয়েছে এই নিবিড় পাঠে কখনো কখনো। আবার এই বিষয়টিও মাথায় রাখা হয়েছে যে, মঞ্চ ও চলচ্চিত্র দুটো ভিন্ন মাধ্যম

---

৫. মিঁজ-অন-সিন (Mise-en-scène) শব্দটি ফরাসি ভাষা থেকে উদ্ভূত। চলচ্চিত্রে দৃশ্যের ভেতর অবস্থিত সকল কিছুই মিঁজ-অন-সিন ধারণার ভেতর পড়ে। অর্থাৎ একটি দৃশ্যের ভেতর দৃশ্যমান সেট, লাইট, অভিনেতা-অভিনেত্রী, তাদের পোশাক, ব্যবহার্য, আলো ইত্যাদি সকল কিছুই মিঁজ-অন-সিন-এর অন্তর্গত। এর ভেতর দিয়ে চলচ্চিত্রে সময় ও স্থানের ধারণা যেমন তৈরি হয়, তেমনি দৃশ্য অন্তর্গত আবেগও ফুটে ওঠে।

– দুটোরই আছে দৃশ্য ও শ্রব্যের মিশেলে গড়া স্বতন্ত্র শৈল্পিক অভিঘাত। শ্রব্য ও দৃশ্যধর্মীতা – এই দুটো বিষয়ই বিরাজমান মঞ্চ ও চলচ্চিত্রে, তবে এ দুই মাধ্যমে এরা প্রযুক্ত হয় স্বতন্ত্রভাবে। এই দুই মাধ্যমেই গতি, ছন্দ, দৃশ্যরস, দৃশ্যের বিন্যাস, অভিনয়, ভঙ্গি, সংগীত, শব্দসহ নানা উপাদান একরূপে উপস্থাপিত হয় না। কিংবা এই দুই মাধ্যমে একই বিষয়ের সমউপস্থাপনা দাবি করাও যৌক্তিক নয়। কারণ:

> Each medium, according to the ways in which it exploits, combines, and multiplies the 'familiar' materials of expression—rhythm, movement, gesture, music, speech, image, writing (in anthropological terms our 'first' media)—each medium ... possesses its own communicational energetics (Gaudreault and Marion. [Trans. Robert Stam] 2004: 65).

এ কারণে এই দুই মাধ্যম – মঞ্চ ও চলচ্চিত্রে *চাকা* নাটকটির কাহিনির ওপর গড়ে ওঠা দুটো শিল্প কাঠামোর নিবিড় পাঠে কোনটি ভালো, কোনটি অপেক্ষাকৃত কম ভালো – সে সিদ্ধান্ত যাচাই মূল অভিপ্রায় হিসেবে গণ্য হয়নি এই গবেষণা প্রবন্ধে। বরং দুই মাধ্যমের স্বতন্ত্র প্রণোদনা, ভাষা ও উপাদানের ওপর ভিত্তি করে প্রযোজনা দুটির অভিঘাত ও শিল্প ভঙ্গির চলন অনুসন্ধান করা হয়েছে এই প্রবন্ধে। একই সাথে, এই দুই মাধ্যমের নান্দনিক ও কারিগরি বিষয়সমূহের বিশ্লেষণ করা হয়েছে গুণগত পদ্ধতির সহায়তায় গবেষকের মৌলিক পর্যবেক্ষণের আলোকে।

সেলিম আল দীনের *চাকা* কথানাট্যের বিষয় ও আঙ্গিক

সেলিম আল দীনের *চাকা* (রচনাকাল ১৯৯০, প্রকাশকাল ১৯৯১) নাটকে রাষ্ট্রীয় সন্ত্রাসে নিহত এক যুবকের লাশ সৎকারে অনাত্মীয় কিছু ক্ষেতমজুর তথা জীবিতের দায়বোধের এক মানবিক গল্প বর্ণিত হয়েছে। গল্পের শরীরে রাজনৈতিক বক্তব্য সরাসরি না থাকলেও এর শিরায় প্রবাহিত হয়েছে রাষ্ট্রের সমালোচনা। এ রাষ্ট্র কল্যাণমূলক রাষ্ট্রের মুখোশে গণঅভ্যুত্থানে নিহত যুবকের লাশ নিজ ঠিকানায় পৌঁছানোর উদ্যোগ গ্রহণ করে, তবে শেষপর্যন্ত দায়িত্ব নেয় না প্রকৃত ঠিকানায় লাশটি পৌঁছুলো কিনা - তার নিশ্চয়তা বিধানের। একই সাথে, এ রাষ্ট্র প্রকাশ করে না সেই যুবকের মৃত্যুর সঠিক কার্যকারণ। কারণ স্বৈরাচারী সরকারের শাসনামলে রাষ্ট্রের একনায়কতান্ত্রিক ও আগ্রাসী কাঠামোর বিরুদ্ধে প্রতিবাদমুখর ও বিদ্রোহী হতে গিয়েই সেই যুবকের মৃত্যু হয়েছিল। এভাবে অনেক নাম না জানা যুবক লাশে পরিণত হয়েছিলেন অর্থাৎ শহীদ হয়েছিলেন সে সময়। এই সময়টি মূলত নির্দেশ করছে ১৯৮৭-৮৮ সালের প্রেক্ষাপটে বাংলাদেশের রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা কুক্ষিগত করে রাখা সামরিক ও স্বৈরশাসকের পতনের দাবিতে ঘটে যাওয়া গণঅভ্যুত্থানের কালকে। এ নাটকের মর্মমূলে আছে সেই বেদনা – গণঅভ্যুত্থানে নিহত শহীদ-শবের ঠিকানা অনুসন্ধানের ব্যর্থতা ও বিভিন্ন গ্রামবাসীদের তাকে নিজ গ্রামে শেষ শয্যাদানের অপারগতা। নাট্যকার নাম-পরিচয় খুঁজে না-পাওয়া এই শহীদের লাশকে নানা গ্রামময় গরুর গাড়িতে পরিভ্রমণ শেষে সেই গাড়ির গাড়োয়ান আর তার সঙ্গীদের নিজ হাতে কাটা কবরে শায়িত করান। এ প্রসঙ্গে নাট্যকার বলেন: "নীল আকাশ, নদী, উজ্জ্বল সূর্যকিরণ, মৌমাছির ঝাঁক, দিগন্ত রেখা, জোৎস্নার কুহক, নিষ্পাপ ষাঁড়ের শরীরে রক্তপাত প্রভৃতির মধ্য দিয়ে শব চলে গেছে ক্ষেত মজুরদের হাতে কাটা গোরে (দীন, ১৯৯১: ৪৩)।"

কাকেশ্বরী নদীর তীরে এলংজনি গ্রাম। এ গাঁয়ের হাসপাতালে শহর থেকে আসে অপঘাতে মৃত যুবকের লাশ। (হতে পারে) তার নাম হোসেনালি। এখানে 'হোসেনালি' নামের ভেতর নব্বইয়ের গণআন্দোলনে নিহত শহীদ নূর হোসেনের নামটির ইঙ্গিত যেন আমরা পাই। পঞ্চাশ টাকার বিনিময়ে হাসপাতালের ডাক্তার একটি গরুর গাড়ির গাড়োয়ান ও তার পইরাতদের দায়িত্ব দেয় লাশটিকে নিজ ঠিকানায় পৌঁছানোর। এই গাড়ি বোশেখের ভোরে রওয়ানা হয়েছিল জলি ধান তুলতে। অথচ তাদের

চিরচেনা সোনালি ধানের আঁটিমুখী যাত্রার বিপরীতে তারা রওয়ানা হয় অস্পষ্ট ঠিকানার এই লাশটিকে গন্তব্যে পৌঁছানোর অভিযাত্রায়। জলি ধান পারাপারে অভ্যস্ত ও সোনালি ধানের ঝুমঝুমি চেনা গাড়োয়ান, তার সঙ্গী দুই পইরাত আর হাসপাতালের ডোম ধরমরাজ লাশের গন্তব্য খুঁজতে পাড়ি দেয় নানা চড়াই উৎরাই। ঠিকানা না পেয়েও তারা দমে যায়নি। চাকার আবর্তনে আবর্তনে মৃতের প্রতি তাদের ভেতর জন্ম নেয় সহানুভূতি ও লাশটিকে সৎকারের কর্তব্যবোধ। এক পর্যায়ে গাড়োয়ান আর তার সঙ্গীদের মতো পাঠক-দর্শকও যেনো এক দায়বদ্ধতা ও আত্মীয়তার সূত্রে আবদ্ধ হন সেই ঠিকানা না পাওয়া লাশের সাথে। *চাকা* নাটকে রাজনৈতিক বাদানুবাদের চাইতেও বড় হয়ে ওঠে জীবিতের সাথে মৃতের এই মানবিক সম্পর্কের যোগসূত্র।

বাংলার জলকাদা কিংবা ধূলিতে সেলিম আল দীনের *চাকা*র যে পরিভ্রমণ তাতে জীবনের নানা মাত্রিক দিকের যে প্রকাশ ও ব্যাপ্তি, তাকে তুলে আনতে নাট্যকর রচনা করেন নতুন নাট্য আঙ্গিক 'কথানাট্য'। কথার শাসনে রচিত হয় এই নাট্যরীতি। একে বলা চলে, "বাঙলা পাঁচালি ও কথকতার ধারায় রচিত সমকালীন নাটক" (দীন, ১৯৯৮: ৫৪)। কথা, কাব্য, সংলাপ, নৃত্য, গীত, কখনও নাটকীয়তার সংযোগ, আবার কখনওবা নাটকীয়তার ভাঙনে এই নাট্যরীতির নাটকে দোলায়িত হয় বর্ণনাত্মক নাট্যাভিনয়রীতির মূল সুর। হাজার বছরের বাংলা বর্ণনাত্মক নাট্য পরিবেশনার ঐতিহ্যবাহী ধারাটি পর্যবেক্ষণ করলে এ সত্য সহজেই অনুমেয় হয় যে, এ অভিনয়রীতি কথা, কাব্য, সংগীত ও নাটকের এক 'দ্বৈতাদ্বৈতবাদী' রূপের সংশ্লেষ। এখানে গায়েন আসরে আসরে কোনো একটি কিচ্ছা বা কাহিনিকে দোহার সহযোগে বর্ণনা, অভিনয়, গান, নাচ ও গল্পের এক সমন্বিত শিল্পরূপে উপস্থাপন করেন। আর নানা শিল্পের সমন্বিত এই পরিবেশনার আবেদন দর্শকের কল্পনার রাজ্যে। যে কারণে স্বর্গ-মর্ত্য-পাতালের যে কোনো ঘটনা গায়েনের নৃত্য-গীত-নির্ভর পরিবেশনায় বাস্তব দৃশ্যরূপমুখী না হয়ে মূর্ত হয়ে উঠে দর্শকের কল্পনার ভুবনে। এই অভিনয় রীতি কথকতা নামেও পরিচিত। উদাহরণস্বরূপ কৃত্তিবাসের *রামায়ণ*-এর প্রসঙ্গ উল্লেখ করা যায়, যা কথকতা রীতিতেও পরিবেশিত হয় মূলে পাঁচালি ধারায় পরিবেশিত হওয়া সত্ত্বেও। সেলিম আল দীন সৃষ্ট *চাকা* কথানাট্যের সাথে আছে কথকতার এক নিবিড় যোগ যদিও তা (কথকতা) মূলত অভিনয়রীতি।

এ নাট্যে বর্ণনা, সংলাপ, নৃত্য-গীতের বিচিত্রমুখী শিল্পপ্রভা এক সংহত ঐক্যের সূত্রে আবদ্ধ। পুরো নাটকটি বর্ণিত হচ্ছে কথকের কথায়। কথকের কথনের মধ্য দিয়ে এই আখ্যান বর্ণনা যে ঐতিহ্যবাহী নাট্যের অভিপ্রায়কে নিশ্চিত করে – তার প্রমাণ মেলে বিভিন্ন স্থলে দর্শকদের উদ্দেশ্য করে কথকের "হে দর্শক শ্রোতৃমণ্ডলী", "হে দৃশ্য ও বর্ণনা পিপাসু সুধী মণ্ডলী", "শ্রোতৃমণ্ডলী" ইত্যাদি বিশেষণ প্রয়োগের ভেতর। অর্থাৎ নাটকটির গল্প বর্ণনার বিভিন্ন স্থানে কথক সরাসরি দর্শকের সাথেও এক কথপোকথনে যুক্ত হন, যা ঐতিহ্যবাহী নাট্যের অভিনয়রীতিতে দৃশ্যমান এক কৌশল। আবার কথক কখনও হয়ে উঠছেন একটি চরিত্র – চরিত্রের সংলাপ বিনিময়ের ফাঁকে, মুহূর্তেই সে আবার ফিরে আসে কথকের ভূমিকায়। এভাবে আখ্যানের চলনে কখনো চরিত্রাভিনয়, আবার কখনো চরিত্র থেকে বেরিয়ে একক গায়েন অভিনেতার বর্ণনাত্মক ভঙ্গির ইঙ্গিত আছে এ নাট্যের পরতে পরতে।

[কথকের বর্ণনা][৬] কথক হাটু গেড়ে বসে মিস্ত্রির সামনে

[চরিত্র হয়ে কথকের সংলাপ] এ ভাই হামাকের চাকাটায় এট্টু ঝামেলা হয়েছে

[মিস্ত্রীর প্রত্যুক্তি] কি হয়েছে গো

৬. তৃতীয় বন্ধনীর এই অংশগুলো *চাকা* নাটকে নেই। এখানে অনুধাবনের সুবিধার্থে নির্দিষ্ট চরিত্র/কথকের উক্তি, ও বর্ণনা অংশসমূহ বন্ধনীর ভেতর উল্লেখ করা হয়েছে।

[বাহেরের উক্তি]	না এই আরা টা ঢিলে হয়েছে
[মিস্ত্রীর উক্তি]	অ
[কথকের বর্ণনা]	মিস্ত্রি চাকার পুঠি ঠিক করছিল বাটালি ঠুকে ঠুকে। কালো মুখে কাঁচাপাকা দাড়ি *[৭] সবুজ চেকলুঙ্গি ভেদ করেছে হাঁটু কালো তেল চিকচিকে।। বাঁকা মেরুদন্ড তাই ঘাড়টা না তুলেই সামনে জোয়াল নামানো গাড়ীটার চাকার দিকে তাকায় *বেড়ের চারপাশে বৃত্তাকারে চোখ ঘুরিয়ে এনে গাড়োয়ানের মুখে নির্বিকারে তাকায় একবার (দীন, ১৯৯১: ৯)।।

সত্যিকার ভাবে, এই নাটক রচনার সময়কাল থেকে উপনিবেশিক ভাবধারার ইউরোপীয় নাটকের সংলাপনির্ভর নাট্যকাঠামোকে সম্পূর্ণরূপে প্রত্যাখ্যান করেন সেলিম আল দীন। উল্লেখ্য, *চাকা* নাটকেও সংলাপ আছে, তবে নাটকে বর্ণনার বিস্তৃতি এবং নৃত্য-গীতের প্রয়োগ এর সংলাপকে করেছে ঐতিহ্যমুখী নাট্যের এক উপাদান হিসেবে, যা অন্যান্য উপাদানের সাথে সংশ্লেষ ঘটিয়ে ধাবিত হয় দ্বৈতাদ্বৈতবাদী শিল্পের এক সর্বতীর্থমুখী রূপে। আবার প্রকৃতি ও প্রাণিকূল এ নাটকে যেহেতু হয়ে উঠেছে অনন্য অনুষঙ্গ তাই সংলাপের বাধা-ধরা গঠনও তাঁর (নাট্যকারের) কাছে যথেষ্ট মনে হয় না প্রকৃতির বিপুল বিস্ময় ও বিচিত্র ভাষ্যকে তুলে ধরার নিমিত্তে। প্রকৃতির মাঝে নিত্ত বিরাজমান সৃষ্টি ও লয়ের যে ধারাবাহিকতা – তাও উঠে আসে *চাকা*র আবর্তনে সেলিম আল দীনের অনন্য সৃজনকুশলতায়। সবসাচী লেখক ও নাট্যকার সৈয়দ শামসুল হক এ নাটক প্রসঙ্গে বলেন:

> 'চাকা' আমার কাছে এক বিস্ময়কর সৃষ্টি বলে মনে হয়েছে; জীবনের ধারাবাহিকতা, জীবনের একই সংগে নশ্বরতা ও অমরতা সেলিম আল দীন তাঁর এই কথানাট্যের শরীরে এক আশ্চর্য বেগ ও গভীর মমতায় উপস্থাপন করেছেন; এবং উপস্থাপন করেছেন বর্ণনাংশ এমন এক ভাষায় যা মহাকাব্য ভাঙা কথকতার এক প্রতিভারঞ্জিত প্রতিদ্বন্দ্বী হয়ে উঠে (হক, ১৯৯১: ৫)।

চাকা নাটকের আঙ্গিকের উৎস গুণাঢ্যের *কথাসরিৎসাগর*-এর গল্প কথনরীতি। নাট্যকার ধ্রুপদী জ্ঞানে বজায় রেখেছেন এর গল্পবিভাজনরীতি যদিও *চাকা*র গঠনরীতি শেষ পর্যন্ত এক স্বতন্ত্ররূপ লাভ করে সেলিম আল দীনের নাট্যসৃজন কুশলতায়। *চাকা*র বিষয়ে নানা প্রসঙ্গের অনুপ্রবেশ ঘটলেও সে সব প্রসঙ্গের ভেতর এক অন্তর্গত যোগাযোগ ও পরিণামমুখী উদ্দেশ্য ক্রিয়া করেছে। অপরদিকে, *কথাসরিৎসাগর*-এ কাহিনির বিস্তারে যুক্ত হয় নানা উপকাহিনি আর ঘটনার নানা শাখা-প্রশাখা (আহমদ, ১৩৯৮ বঙ্গাব্দ: ৯১)। ঘটনার নানামুখী চলন আর কেন্দ্র বিচ্ছিন্ন নানা উপকাহিনির দিক থেকে মিল না থাকলেও, আঙ্গিকগত দিক থেকে চাকা নাটকে দৃশ্যমান হয় *কথাসরিৎসাগর*-এর গল্পবিভাজন রীতির এক ধ্রুপদীনিষ্ঠ রূপ। এ কারণেই এ নাটকে দেখি কথামুখ বা কথাপিঠ, লম্বক ও তরঙ্গ বিভাগ। প্রচলিত নাটক যা অধিকাংশ ক্ষেত্রেই ইউরোপীয় নাট্যরীতির অনুকরণে রচিত – তার সূত্র অনুসারে এই নাটকে নেই দৃশ্য বা অঙ্ক বিভাজনরীতি। পুরো নাটকটি বিভক্ত হয়েছে তিনটি লম্বকে। আবার প্রতিটি লম্বকের অধীনে রয়েছে বিভিন্ন সংখ্যক তরঙ্গ। কাহিনির বিস্তার ঘটেছে মোট ৯টি তরঙ্গে – এর মাঝে প্রথম লম্বকে রয়েছে ৪টি তরঙ্গ, দ্বিতীয় তরঙ্গে ৩টি ও শেষ তথা তৃতীয় লম্বকে তরঙ্গ সংখ্যা ২। লম্বক ও তরঙ্গে বিভাজিত এই নাট্যে কাহিনির প্রাগ্রসরতার মাঝে সমালোচক প্রত্যক্ষ করেন এক ধরনের চলমানতা: "গাড়োয়ানের গাড়ির চাকা বিসর্পিল গ্রাম্যপথে এগিয়ে যায়, নাটকের বিষয়ে এই বাঁকের

৭. *চাকা* নাটকে নাট্যকার সেলিম আল দীন প্রচলিত যতি চিহ্ন ব্যবহার করেননি। বরং তিনি '*' চিহ্ন ব্যবহার করেছেন যতি বোধক ধারণার প্রকাশে।

তরঙ্গ উদ্বেল হয়ে ওঠে। কিন্তু কোথাও কখনও গল্পে বর্ণিত চাকার ধ্বনি মেলায় না (প্রাগুক্ত, ৯১)।" যদিও এই চলমানতার আপাত পরিসমাপ্তি ঘটে গাড়োয়ান ও তার সঙ্গীদের খোঁড়া কবরে লাশটিকে দাফনের ভেতর দিয়ে। লাশটির এই পরিসমাপ্তির পরই নাট্যকার ইঙ্গিত দেন হালাঙ্গা ফকিরের ষাঁড়দ্বয় নিয়ে বাহের গাড়োয়ান আর তার সঙ্গী পইরাতদের দিল সোহগীর বিলে গমন কিংবা সেখানে যাবার প্রত্যয়। অর্থাৎ এ চাকাদ্বয় চলমান – যখন লাশ বয়ে নিয়েছিল তখন জড় বস্তু হয়েও মানবের মতোই কেঁদেছিল তারা। এখন লাশ নেই। তাই রাতের অন্ধকারে ঝিঁঝিঁদের গান ওরা শোনে নিশ্চুপ হয়ে।

এই নাটক রচনায় নাট্যকারের সময় লেগেছিল মোট পাঁচ দিবস ও রাত্রি। বেদনা ও সহমর্মিতার যুথবদ্ধতায় লেখা এই নাটকের রঙকে নাট্যকার বর্ণনা করেন "ধবল রক্তিমাভ" হিসেবে। এখানে 'রক্তিমাভ' অংশটুকু শহীদের শোণিতের ইঙ্গিত দিলেও ধবল ইঙ্গিত দিচ্ছে মৃতের প্রতি জীবিতের সহানুভূতি, টান আর কর্তব্যের পালনের দিকটি। "ধবল রক্তিমাভ" এই নাট্যকথামালা চাকার চলনের নানা বাঁকে তুলে এনেছে মানুষের জীবন-যাত্রা, পুরাণের নানা প্রসঙ্গ, বিভিন্ন ধর্মে প্রচলিত নানা কাহিনি, প্রকৃতির বৈচিত্র্য, এবং মৃতকে গ্রহণের বিষয়ে জীবিত মানুষের অনীহার প্রসঙ্গ। শাস্ত্র নাটকের মতো জীবনের গূঢ় সত্যের অনুসন্ধানে এই নাটক উস্কে দেয় নানা প্রশ্নমালা। দ্বিতীয় লম্বকের প্রথম তরঙ্গে আমরা দেখি গাড়োয়ানের গাড়ির পাশ দিয়ে হেঁটে যায় এক ঘুঘু শিকারি ফাঁদ আর খাঁচা সহ। শুকুর চানের সাথে তার কথা হয় ধৃত পাখির সংখ্যা নিয়ে। তখন বাহের গাড়োয়ান আপন মনে বলে উঠে: "পইখ ধইরতে নাই মাইরতে নাই শুনা হয়* একজনরে জানি যেই বছর শীতে মানিক জোড় মারে সে বছরই তার পুত্র মরে" (দীন, ১৯৯১: ২১)।। গাড়োয়ানের স্বগতোক্তির মাঝে সেলিম আল দীনের প্রকৃতিবাদী মননের সহৃদয় প্রকাশ ঘটেছে – আর তা পরিবেশের ভারসাম্য রক্ষার্থে ন্যায়ধর্মের সমার্থক হয়ে উঠেছে। এই একই লম্বক ও তরঙ্গের আরও একটি প্রসঙ্গ উল্লেখ্য – গাড়োয়ানের গাড়ির পাশ দিয়ে যখন দুটি সফল গরুর গাড়ি ধানের আটি বোঝাই করে ভেজা ভেজা গন্ধ ছড়িয়ে যায়, তখন বাহেরের মনে হতাশার পরিবর্তে আত্মতৃপ্তি জাগে, সে ভাবে: "শস্যের চেয়ে কি লাশের মূল্য কম" (প্রাগুক্ত, ২৩)। এভাবে খুব সাধারণ এক ক্ষেতমজুর বাহের-এর ভেতর মৃতের প্রতি দায়বদ্ধতার যে দৃষ্টিভঙ্গি এখানে নাট্যকার জুড়ে দেন – তাতে মানব ধর্মের গূঢ় সত্যটি ব্যক্ত হয়। তা সরাসরি কোনো ধর্মীয় শাস্ত্র উদ্ভূত বাণীকে নির্দেশ না করলেও এর ভেতর দিয়ে মানবতার জয়গানই গাওয়া হয়েছে। আর তার অভিঘাত ধর্মীয় বা ন্যায় শাস্ত্রের চেয়ে কোনো অংশে কম নয়।

নাটকের প্রায় শেষ দিকেও কথকের মুখে সেলিম আল দীন এমন এমন প্রসঙ্গের অবতারণা করেন যা তৎকালীন রাষ্ট্রের স্বৈরাচারী আচরণের সমালোচনাকেই ইঙ্গিতের ঢঙে হাজির করে। আর এতে অনুরণিত হয় ন্যায়ের প্রতিবিধানের প্রতি দর্শকদের উদ্বোধনের এক আহ্বান: "শ্রোতৃমণ্ডলি* এখন করুণা জাগে তাদের জন্য যারা তাকে হত্যা করেছে যারা তাকে ভুল ঠিকানায় দিকে দিকে প্রেরণ করেছে* করুণা জাগে তাদের জন্য যারা পেট চিরেছে হত্যার কারণ গোপন করেছে*" (প্রাগুক্ত, ৪০)। স্বৈরাচারী সরকারের নির্মমতায় এভাবে লাশে পরিণত হওয়া যুবকদের মৃত্যুকষ্টকে যে ভাবে সেলিম আল দীন এখানে বর্ণনা করেন – তাতে একটি 'অশুভ' রাষ্ট্রীয় কাঠামোর ইঙ্গিত আমাদের সামনে স্পষ্ট হয়ে ওঠে। একই সাথে তাতে মূর্ত হয় সমকালীন ও চিরকালীন বিষয়। কারণ সমকালীন স্বৈরশাসকের নিয়ন্ত্রণাধীন এই রূপ রাষ্ট্রের সন্ত্রাসমূলক কর্মকাণ্ড যে কোনো সভ্যতার অগ্রগতির পরিপন্থি – তা এক চিরায়ত অথচ নিদারুণ সত্যের স্পর্ধায় আবির্ভূত হয়। এ ভাবে কখনও বর্ণনায়, সংলাপে প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে *চাকা* নাটকে সেলিম আল দীন মানবতার ধর্ম প্রতিষ্ঠার নানা আকাঙ্ক্ষা ও প্রতিবন্ধকতাগুলোকে এমনভাবে ব্যক্ত করেন যে নাটকটি কখনো কখনো হয়ে ওঠে শাস্ত্র নাটকের সমকক্ষ। এই নাটকের প্রকাশিত পাণ্ডুলিপির কথাপুচ্ছে, সেলিম আল দীনও স্বীকার করেছেন যে, *চাকা*

নাটককে কেউ শাস্ত্র নাটক হিসেবে উল্লেখ করলে তিনি বিবাদ করবেন না (প্রাগুক্ত: ৪৪)। সমালোচক উল্লেখ করেন: "নাট্যকারের মতে এ কথানাট্যকে শাস্ত্রনাট্যও বলা যায় যেহেতু অর্থশাস্ত্র বা ধর্মশাস্ত্রের ন্যায় এই নাটকেও কিছু জ্ঞানের উপাদান রয়েছে যা গল্পচ্ছলে উপস্থাপিত হয়েছে" (রেজা, ২০০০: ১০৭–১২৯)। তবে এতে ন্যায় প্রতিষ্ঠার প্রত্যাশা থাকলেও প্রচলিত শাস্ত্রনাটক বর্ণিত ধর্মীয় বিধিনিষেধ প্রতিপালনের কট্টর মনোভাবটিকে তুলে আনা হয়নি। এ কারণেই চাকা নাটকে বর্ণিত শুভ-অশুভের ধারণা আর মানবতাবাদী দৃষ্টিকোণ সমকালের প্রেক্ষাপটকে ভিত্তি করে রচিত হলেও তা বাস্তবতার অবয়বকে ভেঙে উন্নীত হয় এক সার্বজনীন রূপে।

এ নাটককে সেলিম আল দীন রূপক সাংকেতিক নাটক হিসেবেও উল্লেখ করতে চাননি। আবার বাস্তবতার পুনর্নির্মিতিও তিনি করতে চাননি। ফলে রূপক, সংকেত, বাস্তবতা আর পুরাণের নানা উপাদানের সংশ্লেষ ঘটেছে এই নাটকের দেহ ও মনে। আঙ্গিক নির্মাণের দিক থেকেও এমনটি ঘটেছে যেখানে নাটক হয়েও এই কথানাট্য যেন ভাঙতে চেয়েছেন প্রচলিত নাটকের গঠন রীতিকে। কারণ প্রচলিত বাংলা নাটকের গড়ন অনেক ক্ষেত্রেই ইউরোপীয় নাট্য ধারা, বিশেষ করে ইংরেজি নাট্য আঙ্গিকের এক অন্ধ অনুকৃতি যেন। দুশো বছরের ইংরেজ শাসনামলেই বাংলা নাটকের দেহে সংযুক্তি ঘটেছে ঐহিত্যচ্যুত নানা কৃত্রিম অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ। ফলে বাংলা নাটকে উদ্ভূত হয়েছে নন্দনতাত্ত্বিক সংকট। এ বিষয়ে সেলিম আল দীন স্বয়ং উল্লেখ করেছেন: "বাংলা নাটকের আঙ্গিক সঙ্কট ইংরেজ কালে শুরু হয়েছিল – পাঁচালি কথকতার যে ধারা কাব্যে গদ্যে নাট্যে ও উপাখ্যানবর্তী হয়ে উঠবার সম্ভাবনা ছিল তার ক্ষেত্রে ঔপনিবেশিক সংস্কৃতি ও শিল্পনন্দন মধ্য খণ্ডন ঘটাল। ফলে আমাদের উপাখ্যান হয়ে উঠল নভেল, নাট্য হয়ে উঠল কৃত্রিম ও আড়ষ্ট রং ঢঙের সংলাপ সঞ্চালনা" (দীন, ২০০১: ৭–১২)। এই কৃত্রিমতার রাহুগ্রাস থেকে বাংলা নাট্য আঙ্গিককে মুক্ত করে তার আপন বিভার উজ্জ্বলতা দানেই বদ্ধ পরিকর হয়ে উঠেছেন নাট্যকার সেলিম আল দীন।

নাট্য রচনার শুরুর দিকে স্বদেশ ও বর্তমান সময়ের অস্থির বাস্তবতা তাঁর নাটকের বিষয়ে বিক্ষিপ্তভাবে উঠে এলেও আঙ্গিক নির্মাণে তিনি কখনও কখনও পাশ্চাত্য প্রভাবকে এড়াতে পারেননি। তবে ধীরে ধীরে তিনি দেশজ নাট্যরীতির প্রতি নিবেদিত হয়েছেন। অন্বেষণ করেছেন লোকজ জীবনাশ্রিত কৃত্যনির্ভর নাট্যের গড়ন ও শিল্প কাঠামোকে। তাঁর রচিত *কিত্তনখোলা* (১৯৮১) নাটক থেকে আমরা প্রত্যক্ষ করি এই শেকড় সন্ধানী প্রবণতা। এ পর্বের তিনটি নাটক *কিত্তনখোলা*, *কেরামত মঙ্গল* (১৯৮৫), *হাত হদাই* (১৯৮৯)-এ চলমান ছিল বর্ণনাত্মক বাংলা নাট্যের প্রবণতা ও প্রেরণা অনুসন্ধান। তবে এ পর্বের পরবর্তী সময়ের তিনটি নাটক *চাকা* (১৯৯১), *যৈবতী কন্যার মন* (১৯৯২), *হরগজ* (১৯৯২)-এ বাংলা নাট্যের এক বিশেষ শিল্পরীতি কথানাট্য পরিস্ফুটিত হয় সর্ব শিল্পতীর্থগামী প্রবণতায় – দ্বৈতাদ্বৈতবাদী নন্দনতত্ত্বের রূপ-রসে জারিত হয়ে। এরপর তিনি ক্রমাগতই নাট্যরীতি ও বিষয়ের ভাঙন-গড়নে নিরত থেকেছেন তাঁর নাট্যরচনায়। সৃষ্টি করেছেন কালস্পর্শী বিষয়ের কালোত্তীর্ণ অভিঘাতে সৃষ্ট নাটক: *বনপাংশুল* (১৯৯৭), *প্রাচ্য* (১৯৯৮), *নিমজ্জন* (২০০২), *ধাবমান* (২০০৭), *পুত্র* (২০০৮) প্রভৃতি। এ সকল নাটকে কখনও স্বদেশের মৃত্তিকা সংলগ্ন বিষয়, কখনও স্বদেশ-উর্ধ্ব বিষয় এসেছে বিশ্ব মানবতার সার্বজনীন স্বর হয়ে। তবে বিষয়ের এই বিপুল বিস্তারী চলনের মাঝে সেলিম আল দীন নিরত থেকেছেন নিজ ভূগোল উৎসারিত নাট্য আঙ্গিকের শিল্পশৈলী অনুসন্ধান ও পুনঃসৃজনে। এ কারণে তাঁর এ সকল নাটকে আমরা প্রত্যক্ষ করি চিরায়ত বাংলা নাট্যের এক শেকড়মুখী নন্দনতাত্ত্বিক অভিযাত্রা, যেখানে স্পন্দিত হয় সকল শিল্পের এক অদ্বৈত ঝংকার। বাংলা নাট্যের এই অদ্বৈতরূপ প্রসঙ্গে আবারও স্মরণ করতে হয় সেলিম আল দীনের উক্তি: "নাটক হয়েও আমাদের নাটক গান থেকে আপনাকে বিচ্ছিন্ন করে নি, নৃত্যকে করেছে তার ধমনী, কাব্যের গড়নটাকে প্রায় সর্বত্র করেছে আপন অঙ্গাভরণ – তার প্রাণের নিখিল লোকায়ত জীবন ও ধর্মকে অবলম্বনপূর্বক আসর থেকে আসরে পরিপুষ্ট হয়েছে" (দীন, ১৯৯৬: ৩)।

সুতরাং আপন ভূগোলের নাট্যরীতির শেকড় সন্ধানী প্রেরণায় সেলিম আল দীন তাঁর *চাকা* নাটকে ফিরে গেলেন লোকায়ত নাট্যরীতির সর্ব শিল্পতীর্থগামী প্রবণতার দিকে। কথার শাসনের রচিত এই নাটকে কথা, নাটক, সংগীত, নৃত্য, উপাখ্যান আর বর্ণনার মিশেলে সমকাল, সমকালের রাজনীতি, রাষ্ট্র-নিপীড়নে ক্ষয় হওয়া তরুণ প্রাণের বিনষ্টি ও ক্ষেত মজুরের হাতে সেই তরুণের শেষ শয্যা দানের কৃত্য উন্নীত হয় পুরাণের সর্বকালীন আভায়।

_চাকা_ কথানাট্যের মঞ্চ প্রয়োগ ও চলচ্চিত্রায়ন

চাকা কথানাট্যে সেলিম আল দীন দেশজ নাট্যরীতির এক শৈল্পিক প্রয়োগ ঘটালেও এ নাটক প্রথম বাংলাদেশে মঞ্চায়িত হয়নি। *চাকা*র প্রথম মঞ্চপ্রয়োগ হয় বিদেশের মাটিতে – যুক্তরাষ্ট্রে। ১৯৯০ সালের ২৬ অক্টোবর তারিখে সেখানকার অ্যান্টিওক কলেজের নাট্যশালায় নাটকটি প্রথম মঞ্চায়িত হয় (দীন, ১৯৯১: ৪৭; এবং আহমেদ, ২০২২: ১৭)। প্রযোজনাটির নির্দেশনায় ছিলেন সৈয়দ জামিল আহমেদ ও ডেনি প্যাট্রিজ। এর ইংরেজি অনুবাদ করেন সৈয়দ জামিল আহমেদ এবং সেই অনুবাদকে মঞ্চ উপযোগী করে 'দ্যা হুইল' নামে ইংরেজিতে রূপান্তর করেন স্টিভ ফ্রেইডম্যান। মূল ধারার থিয়েটারে মঞ্চায়িত না হয়েও, ছোট শহরে নাটকটির মঞ্চায়ন বিস্ময়ের সৃষ্টি করতে সমর্থ হয়েছিল দর্শকদের মাঝে। ইয়োলো স্প্রিং-এর উদ্ধৃতি দিয়ে জামিল আহমেদ এ ধরনের বিস্ময়ের পেছনে এর অভিনব ও ভিন্নধর্মী মঞ্চায়নের কথা উল্লেখ করেন, আর যে প্রযোজনার বীজটি মূলত উদ্ভূত হয়েছে বাংলাদেশের মতো একটি দরিদ্রক্লিষ্ট দেশ থেকে (প্রাগুক্ত, ১৮)। আর সে দেশটিও দর্শকদের নিকট অপরিচিত। এখন প্রশ্ন জাগতে পারে যে, এই নাটক প্রথম বাংলাদেশে মঞ্চায়িত হয়নি কেন? *চাকা* যখন লেখা হয় ততদিনে সেলিম আল দীন বাংলাদেশের একজন প্রতিশ্রুতিশীল ও প্রতিষ্ঠিত নাট্যকারদের একজন। ঢাকা থিয়েটার তাঁর অনেক নাটকই মঞ্চে এনেছে ততদিনে। কিন্তু *চাকা* এই দলের মাধ্যমে প্রথম মঞ্চে না এসে কেন বিদেশের মাটিতে মঞ্চস্থ হলো? এর উত্তর আমরা কিছুটা পাই জামিল আহমেদ-এর লেখা থেকে: "সেলিম আল দীন নিশ্চিত ছিলেন যে তাঁর রচনা *চাকা* বাংলাদেশের আধুনিক থিয়েটারে এক পরিবর্তনের ধারক রূপে স্বীকৃত হবে। কিন্তু ঢাকা থিয়েটারের কতিপয় জ্যেষ্ঠ অভিনেতা রচনাটিকে নাট্যরূপে স্বীকৃতি জানাতে অসম্মতি প্রকাশ করে, এবং এটি মঞ্চায়ন যোগ্য নয় বলে অভিমত প্রকাশ করে" (প্রাগুক্ত, ১৬)। জামিল আহমেদ-এর উক্তি থেকে ধারণা করা যায় যে, প্রচলিত ইউরোপীয় ধারার অনুকৃতিতে সৃষ্ট নাট্য আঙ্গিকের সাথে *চাকা*র গঠনের বৈশাদৃশ্যই নাটকটি প্রত্যাখানের মূল কারণ হিসেবে দেখেছেন ঢাকা থিয়েটারের জ্যেষ্ঠ অভিনেতাগণ। এখানে উল্লেখ্য, ঢাকা থিয়েটার প্রতিষ্ঠার সময় থেকেই অঙ্গীকারবদ্ধ ছিল মৌলিক ও দেশজ নাটক মঞ্চায়নের বিষয়ে। *চাকা* মঞ্চায়নের পূর্বে তাদের অনেক প্রযোজনাতেও সেই অঙ্গীকারটি স্পষ্ট। এ বিবেচনায় জামিল আহমেদ-এর উপর্যুক্ত বক্তব্যটি প্রশ্নসংকুলন হয়ে দাঁড়ায়। এ ছাড়া অত্র প্রবন্ধের লেখক এই প্রবন্ধ সংশ্লিষ্ট গবেষণা চলাকালে ঢাকা থিয়েটারের অন্যতম সদস্য ও অভিনেত্রী শিমূল ইউসুফের সাক্ষাৎকার গ্রহণ করেন, যিনি ঢাকা থিয়েটার প্রযোজিত *চাকা* (প্রথম মঞ্চায়ন ১৯৯১ সালের মার্চ মাস) নাটকের সুরারোপ ও অভিনয়সহ নানা ক্ষেত্রে পালন করেছেন গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা। তিনিও জামিল আহমেদ-এর উপরোক্ত উক্তির সত্যতা নেই বলে উল্লেখ করেন ।[৮]

---

৮. শিমূল ইউসুফ-এর ভিডিও সাক্ষাৎকার থেকে উদ্ধৃত। সাক্ষাৎকার গ্রহণ করেছেন অত্র প্রবন্ধ রচয়িতা। সাক্ষাৎকার গ্রহণের কাল: জুন, ২০২৩।

নাট্যকার সেলিম আল দীন স্বয়ং এ নাটকের প্রথম গল্প বর্ণনে তাঁর শিল্পসঙ্গী এবং ঢাকা থিয়েটারের অন্যতম সংগঠক ও নির্দেশক নাসির উদ্দীন ইউসুফ-এর উচ্ছ্বাস প্রকাশের প্রসঙ্গটি উল্লেখ করেন (দীন, ১৯৯১: ৪৩)। লক্ষণীয়, নাট্যকারও কোথাও ঢাকা থিয়েটার কর্তৃক এ নাটক প্রত্যাখ্যানের ঘটনাটি উল্লেখ করেননি। বরং নাটকটি তিনি উৎসর্গ করেছেন ঢাকা থিয়েটারের অন্যতম অভিনেত্রী শিমূল ইউসুফকে। জামিল আহমেদ ১৯৯০ সালে যুক্তরাষ্ট্রে ফুলব্রাইট বৃত্তি নিয়ে অ্যান্টিওক কলেজে শিক্ষকতা করতে যান, আর এই সূত্রে সেখানে তাঁর *চাকা* নাটক প্রযোজনার যে সুযোগ ঘটে – সেই অভিজ্ঞতা ও সুযোগ নিঃসন্দেহে প্রশংসার যোগ্য। তবে তাকে অধিক মহিমান্বিত করতে গিয়ে জামিল আহমেদ-এর লেখায় ঢাকা থিয়েটার কর্তৃক *চাকা* মঞ্চায়নের অস্বীকৃতির প্রসঙ্গ অপ্রয়োজনীয় বলে বিবেচিত হয় এবং তার সত্যতাও সেভাবে খুঁজে পাওয়া যায় না অন্যান্যদের ভাষ্যে।

চিত্র ১. ঢাকা থিয়েটার প্রযোজিত *চাকা* নাটকের একটি দৃশ্যের স্থিরচিত্র (চিত্র প্রাপ্তির উৎস: প্রবন্ধ রচয়িতার ব্যক্তিগত সংগ্রহ)।

বাংলাদেশে *চাকা* নাটকটিকে প্রথম মঞ্চে আনে ঢাকা থিয়েটার ১৯৯১ সালের মার্চ মাসে। নাটকটি নির্দেশনার দায়িত্বও দেয়া হয় তৎকালীন ঢাকা থিয়েটারের অন্যতম প্রতিশ্রুতিশীল কর্মী ও নির্দেশক সৈয়দ জামিল আহমেদকে। ২০ জন অভিনেতা-অভিনেত্রীর দ্বারা নাটকটি মঞ্চস্থ হয়। এঁদের মাঝে অভিজ্ঞ মঞ্চ অভিনেত্রী ও সংগীত শিল্পী শিমূল ইউসুফ ও বিভিন্ন মাধ্যমে স্বাক্ষর সৃষ্টিকারী প্রখ্যাত অভিনেতা রাইসুল ইসলাম আসাদ অন্যতম। অসংখ্য চরিত্র, যা একই সাথে মানব ও প্রকৃতির প্রাণিকূলকে নির্দেশকারী – তাদের চরিত্রায়নে এই প্রযোজনার অভিনেতা-অভিনেত্রীদের বেগ পেতে হয়নি। কারণ বর্ণনাত্মক নাট্যাভিনয় রীতির এই প্রযোজনায় একই অভিনেতা/অভিনেত্রী পরিভ্রমণ করেছেন চরিত্র থেকে চরিত্রে। আবার কখনও চরিত্র থেকে বেরিয়ে বর্ণনা প্রদানকারীর ভূমিকাতেও তাঁরা অবতীর্ণ হয়েছেন অবলীলায়। তবে মূল সূত্রধরের ভূমিকায় অভিনয় করেছেন শিমূল ইউসুফ। তাঁকেও কথকের ভূমিকার বাইরে গিয়ে উপস্থাপন করতে হয়েছে প্রায় ৫/৬টি চরিত্র। শিমূল ইউসুফের সাক্ষাৎকার থেকে আমরা জানতে পারি যে, প্রযোজনাটির মহড়া শুরুর পূর্বে তিনি এবং সৈয়দ জামিল আহমেদ তিনমাস সময়কালের ভেতর নির্দিষ্ট সময়ে মানিকগঞ্জের হাকিম আলী গায়েন-এর কাছে বাঙলা লোকজ আঙ্গিকের নাট্যাভিনয় রীতি, যা বর্ণনাত্মক নাট্যাভিনয় রীতির ভিত্তি – তার দীক্ষা গ্রহণ

করেছিলেন। নাট্যকার সেলিম আল দীন জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ের জিমনেশিয়াম-এ সেই গায়েন ও তাঁর দলকে আনার ব্যবস্থা করেছিলেন। সুতরাং সংগীত, নৃত্য, অভিনয় ও বর্ণনার মিশেলে ঐতিহ্যবাহী বাঙলা নাট্য আঙ্গিকের যে ধারা প্রবাহিত ও চর্চিত হয়ে আসছিল আমাদের গ্রাম-গঞ্জের নাট্যপালার মাঝে – তাকে এই কথানাট্যের মঞ্চ প্রয়োগে তুলে আনা ছিল ঢাকা থিয়েটারের অন্যতম প্রধান লক্ষ্য। উল্লেখ্য, জামিল আহমেদ-এর ভাষ্যে মার্কিন মুল্লুকে নাটকটি মঞ্চায়নের পূর্ব অভিজ্ঞতাকেই অধিক কৃতিত্ব দেয়া হয়েছে ঢাকার মঞ্চে এর বর্ণনাত্মক নাট্যরীতির সফল প্রয়োগের ক্ষেত্রে। তিনি বলেন: "[...] এ মত স্বীকৃতি অপরিহার্য যে, আমরা ১৯৯১ সালের *চাকা* নির্মাতাগণ, এই নাট্য মঞ্চায়নে সক্ষম হয়েছিলাম 'পাশ্চাত্য' থেকে লব্ধ গল্প পরিবেশনের মার্কিন কৌশলের সাহায্যে।" সত্যিকার অর্থে, যুক্তরাষ্ট্রের প্রচলিত নাট্যাভিনয় রীতি চরিত্রাভিনয় রীতির উপর ভিত্তি করে প্রতিষ্ঠিত। গল্প কথন আর আসরকেন্দ্রিক নৃত্য-গীত নির্ভর অভিনয়ের যে ধারা – তা প্রাচ্য উদ্ভূত। যুক্তরাষ্ট্রে *চাকা*কে মঞ্চ প্রয়োগের ক্ষেত্রে জামিল আহমেদ সেই প্রাচ্যদেশীয় কৌশলটাকেই হয়ত প্রয়োগ করেছেন যদিও তার সহ-পরিচালক ছিলেন একজন মার্কিনি। এই নাট্য প্রযোজনার বিভিন্ন দিকের মূল্যায়ন বিষয়ে এই প্রবন্ধের পরবর্তী অংশে আরও বিস্তৃত আলোচনার অবতারণা করা হয়েছে। সবমিলিয়ে ঢাকা থিয়েটারের *চাকা* বাংলাদেশের শহরকেন্দ্রিক নাট্য প্রযোজনার ইতিহাসে ঐতিহ্যবাহী বাংলা বর্ণনাত্মক নাট্যাভিনয় রীতির সফল মঞ্চ প্রয়োগের মাধ্যমে এই অভিনয়রীতিকে যেন দিয়েছিল শেকড়মুখী এক পুনর্জাগরণী প্রেরণা।

জানা যায়, বাংলাদেশে এই নাটকের দ্বিতীয় মঞ্চ প্রয়োগটি সম্পন্ন হয়েছিল সাভারের বুনন থিয়েটার-এর মাধ্যমে (খান, ২০২২: ৪৭)। এদের *চাকা* প্রযোজনার প্রথম প্রদর্শনীটি হয় ২০১১ সালের ৩০ জুন তারিখে। এই নাট্যপ্রযোজনার পরিচালক ছিলেন আনন জামান, মঞ্চ পরিকল্পানায় ছিলেন ফেরদৌস শিপলু, আলো নিয়ে কাজ করেছেন ফেরদৌস শিপলু ও রাজন্য তসলিম, পোশাক পরিকল্পনা করেছেন শাকিলা তাসমিন, কোরিওগ্রাফি করেছেন সামিউন দোলা, সংগীত পরিকল্পনায় ছিলেন অসীম কুমার নাট্য ও প্রযোজনায় "লাঠি খেলা" অংশ প্রয়োগ করেছেন অমৃতাভ মিহির। এই নাট্যপ্রযোজনার নির্দেশক আনন জামান পরবর্তী সময়ে ২০২২ সালে একাডেমিক থিয়েটার প্রযোজনার অংশ হিসেবে নাটকটি আবারও নির্দেশনা দিয়েছেন জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ের নাটক ও নাট্যতত্ত্ব বিভাগের তৃতীয় বর্ষের স্নাতক (সম্মান) শ্রেণির শিক্ষার্থীদের নিয়ে (চিত্র ২)। দুটো ক্ষেত্রেই নাটকটির মঞ্চায়নে বর্ণনাত্মক নাট্যাভিনয় রীতির প্রয়োগ লক্ষণীয়।

চিত্র ২. আনন জামান নির্দেশিত জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ের নাটক ও নাট্যতত্ত্ব বিভাগ-এর তৃতীয় বর্ষের স্নাতক (সম্মান) শ্রেণির প্রযোজনা *চাকা* (২০২২)-এর একটি স্থির চিত্র।[৯]

৯. চিত্রটি প্রাপ্ত হয়েছে ভিডিও চিত্রের স্ক্রিন শট থেকে। ভিডিও চিত্র ধারণ করেছেন মোহাম্মদ সিরাজুল ইসলাম।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের নাট্যকলা বিভাগও (বর্তমানে যা থিয়েটার এন্ড পারফরমেন্স স্টাডিজ নাম ধারণ করেছে) এই নাট্যপ্রযোজনা মঞ্চায়িত করে ২০১৩ সালের ১৭ আগস্ট বিভাগীয় স্নাতকোত্তর প্রযোজনা হিসেবে। এর মঞ্চ ও আলোক পরিকল্পনা এবং নির্দেশনায় ছিলেন এই বিভাগের শিক্ষক সুদীপ চক্রবর্তী। এই নাট্যপ্রযোজনায় দেশজ ও ইউরোপীয় নাট্যকৌশলের নিরীক্ষাধর্মী সংমিশ্রণ ঘটেছে [চিত্র ৩]। প্রাতিষ্ঠানিক পর্যায়ে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ও জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয় ছাড়াও নাটকটি বাংলাদেশের বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ে নাটক বিষয়ক উচ্চতর শিক্ষার পাঠদানে অন্তর্ভুক্ত আছে এবং বিভিন্ন সময়ে এটি মঞ্চায়িত হয়েছে শিক্ষার্থীদের অংশগ্রহণ কিংবা নির্দেশনায়। *ঢাকা* নাট্যপ্রযোজনার সূচনা প্রযোজনা যেমন বহির্বিশ্বে ঘটেছে, তেমনি পরবর্তী সময়েও এই নাটকের আরও নানা নাট্যপ্রযোজনা আর প্রদর্শনীর খবর মিলে পৃথিবীর অন্যান্য প্রান্তে। ১৯৯৩ সালে যুক্তরাষ্ট্রের ভেসার কলেজের পাওয়ার হাউজ থিয়েটারে ভেসার এক্সপেরিমেন্টাল থিয়েটারের প্রযোজনায় নাটকটির ইংরেজি সংস্করণের ৬টি প্রদর্শনী হয়েছে বলে জানা যায় (খান, ২০২২: ৪৮)। এর নির্দেশনায় ছিলেন ডেনি পেট্রিজ। এই একই নির্দেশক ২০০৩ সালের ১৩ থেকে ১৫ নভেম্বর নিউ ইয়র্ক শহরের ল্যাথাম প্লে হাউজ-এ নাটকটি মঞ্চায়িত করেন (আহমেদ, ২০২২: ৫০ [টীকা অংশ])। এ ছাড়াও পরবর্তী সময়ে মার্কিন মুল্লুকে অফ ব্রডওয়েতে এর ইংরেজি সংস্করণ 'দি হুইল' শিরোনামে ১০০০ বারের মতো মঞ্চস্থ হয় (খান, ২০২২: ৪৮)। বিদেশের মাটিতে বিশেষ করে যুক্তরাষ্ট্রের মতো একটি উন্নত দেশে বাংলাদেশের কোনো একটি নাটকের এই মঞ্চায়ন সংখ্যা নিঃসন্দেহে গৌরবের।

চিত্র ৩. সুদীপ চক্রবর্তী নির্দেশিত ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের নাট্যকলা বিভাগ-এর স্নাতকোত্তর প্রযোজনা *ঢাকা* (২০১৩)-এর একটি স্থির চিত্র।[১০]

ভারতেও এই নাটকের হিন্দি অনুবাদ *পাহিয়ে* নামে নতুন দিল্লির ন্যাশনাল স্কুল অব ড্রামায় নির্দেশনা দেন সৈয়দ জামিল আহমেদ। এই শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের শেষ বর্ষের শিক্ষার্থীদের প্রযোজনা হিসেবে

১০. চিত্রটি প্রাপ্তির উৎস: ২২ আগস্ট ২০১৩ সালে *বিডি নিউজ টোয়েন্টি ফোর*-এ প্রকাশিত "নাটমণ্ডলে চাকা" শীর্ষক সংবাদ প্রতিবেদন। প্রতিবেদনটির অনলাইন লিংক: https://bangla.bdnews24.com/glitz/article662546.bdnews (লিংকে অনুপ্রবেশের তারিখ : ১ জনু, ২০২৩)

নাটকটি মঞ্চায়িত হয় ২০০৬ সালের ১২ থেকে ১৫ অক্টোবর। লক্ষণীয় *ঢাকা* নাটকের বিষয়ে নিহিত মানবিক সম্পর্কের দিকটি এই নাটকটিকে দেশ ও দেশের বাইরের দর্শকদের কাছে নিয়ে গেছে এক সর্বজনগ্রাহ্য আবেদনে।

আর এই একই নাটকের কাহিনি অবলম্বন করে নির্মিত মোরশেদুল ইসলাম পরিচালিত *ঢাকা* (১৯৯৩) চলচ্চিত্রও সৃষ্টি করতে সমর্থ হয় সার্বজনীন আবেদন। আর এই মানবিক গল্পকে চলচ্চিত্রের ভাষায় কুশলতার সাথে ফুটিয়ে তোলার স্বীকৃতি স্বরূপ এ চলচ্চিত্র অর্জন করে বিশ্বের গুরুত্বপূর্ণ নানা পুরস্কার।[১১] অবশ্য চলচ্চিত্রটি অনেক ক্ষেত্রেই নাটকের আবেদনের শৈল্পিক বিস্তৃতিকে ধারণ করতে পারেনি বলেই মনে করেন বাংলাদেশের অনেকে সমালোচক ও গবেষক। নাট্যতাত্ত্বিক ও গবেষক লুৎফর রহমানের মতে: "চাকা চলচ্চিত্রের মূল Text এর তুলনায় একটি খণ্ডিত গল্পের চিত্ররূপ মাত্র। তাই সেলিম আল দীন কৃত চাকার পাঠক দর্শকের নিকট মোরশেদুল ইসলামের চিত্রনাট্য কোন তাৎপর্যপূর্ণ অভিপ্রায়কে নিশ্চিত করে না" (রহমান, ২০০৮: ৫০)। এখানে উল্লেখ্য মঞ্চ ও চলচ্চিত্র – দুটো ভিন্ন মাধ্যম। দুটো মাধ্যম শ্রব্য-দৃশ্যের সমবায়ে নির্মিত হলেও এদের আবেদন, অভিঘাত, নির্মাণ-কৌশল, শিল্পভঙ্গিতে আছে স্বাতন্ত্র্য। তাই নাটকের কাহিনি চলচ্চিত্রে রূপান্তরের ক্ষেত্রে এর নাট্যকাহিনি বা মঞ্চ প্রয়োগের রূপ ও কৌশল থেকে ভিন্ন হবে সেটাই স্বাভাবিক। শিল্পের নানা শাখার এই ভিন্নতা কিংবা আন্তঃসম্পর্ক বিষয়ে বিস্তৃত আলোচনার অবকাশ আছে। এরই প্রেক্ষিতে এই প্রবন্ধের পরবর্তী একটি অংশে চলচ্চিত্রটির বিস্তৃত বিশ্লেষণ ও পাঠ উপস্থাপিত হয়েছে।

ঢাকা থিয়েটারের নাট্য প্রযোজনা *চাকা*-এর বিশেষ পাঠ

স্বাধীনতা-উত্তর বাংলাদেশের অস্থির রাজনৈতিক আবহ আর অর্থনৈতিক দিক থেকে এক অনিশ্চিত মুহূর্তে জন্ম ঢাকা থিয়েটারের, ১৯৭৩ সালে (হামিদ, ২০০৫: ৯)। প্রতিষ্ঠার পর থেকেই দেশজ ও মৌলিক নাটক উপস্থাপনের অঙ্গীকার স্পষ্ট হয়ে ওঠে এ দলের নাট্যপ্রযোজনাসমূহে। মৌলিক নাটক সৃজনের দৃঢ় মনোভাবের সাথে জাতীয় নাট্য আঙ্গিক প্রতিষ্ঠার পথে এগিয়েছে এই দল। তাদের এই জাতীয় নাট্য আঙ্গিক সৃজনের শিল্পিত অভিযাত্রায় *চাকা* নাট্যপ্রযোজনার নির্মাণ এবং এর প্রথম প্রদর্শনীর আয়োজন করা হয় ১৯৯১ সালের মার্চ মাসে। নাটকটির মোট প্রদর্শনীর সংখ্যা ৩৭ (প্রাগুক্ত, ১০)। এই নাট্যের নির্দেশক সৈয়দ জামিল আহমেদ, যিনি এর মাঝেই যুক্তরাষ্ট্রে *চাকা* নাটকের নির্দেশনা, অনুবাদ ও মঞ্চায়ন করেছেন সফল ভাবে। এই বিষয়ের উল্লেখ আগেই করা হয়েছে। সুতরাং *চাকা* নাটকটিকে বাংলাদেশের মাটিতে নির্দেশনা দিতে গিয়ে তাঁর নাটকটিকে নির্দেশনার পূর্ব অভিজ্ঞতা অনেকটাই সহযোগী হয়েছে, যদিও সেই অভিজ্ঞতা ছিল বিদেশের মাটিতে – বিদেশি কলাকুশলীদের নিয়ে। বাংলাদেশে এ নাটকটিকে নির্দেশনার পূর্বে তিনি ও শিমূল ইউসুফ দীর্ঘ ৩ মাস কালের ভেতর বিভিন্ন মেয়াদে মানিকগঞ্জের হাকিম আলী গায়েন-এর নিকট নিয়েছেন লোকজ নাট্যরীতির পরিবেশনা কৌশলের দীক্ষা।[১২] শিমূল ইউসুফের সাক্ষাৎকার থেকে প্রাপ্ত তথ্যের উপর ভিত্তি করে আগেই উল্লেখ করা হয়েছে যে, হাকিম আলী গায়েনকে জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ের জিমনেসিয়ামে তিনমাস কালের ভেতর বিভিন্ন সময়ে আনার ব্যবস্থা করেছিলেন নাট্যকার সেলিম আল দীন। জিমনেসিয়ামের সুউচ্চ ভবন ও বড় পরিসর লোকজ নাট্য উপস্থাপনের সহযোগী ছিল। এ ছাড়াও বিশ্ববিদ্যালয়ের এক প্রান্তে এর অবস্থান হওয়াতে তা যেমন কোলাহল মুক্ত ছিল, তেমনি দেশজ নানা বাদ্যের টংকারে ঋদ্ধ

---

১১. দেখুন পরিশিষ্ট, যেখানে এই চলচ্চিত্র অর্জিত নানা পুরস্কারের তালিকা সংযুক্ত হয়েছে।

১২. শিমূল ইউসুফ-এর ভিডিও সাক্ষাৎকার থেকে উদ্ধৃত। সাক্ষাৎকার গ্রহণ করেছেন অত্র প্রবন্ধের রচয়িতা। সাক্ষাৎকার গ্রহণের কাল: জুন, ২০২৩।

লোকায়ত নাট্যের উচ্চগ্রামের বর্ণনাত্মক অভিনয় ও দোহারদের সমবেত গানের প্রশিক্ষণকালীন দীর্ঘ সময়ের আওয়াজ হয়ত এই বিদ্যায়তনের অন্যান্য শিক্ষা কার্যক্রমকে ব্যাহত করেনি। এই বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষকতার সূত্র ধরে জিমনেসিয়ামে হাকিম আলী গায়েনকে তাঁর দলসহ আনা ও তাঁদের পরিবেশনার ভেতর দিয়ে ঢাকা থিয়েটারের কিছু নাগরিক সদস্যদের প্রশিক্ষণ প্রদানের কর্মযজ্ঞ আয়োজন সহজসাধ্য ছিল সেলিম আল দীনের পক্ষে। শুধু এই প্রশিক্ষণ আয়োজনের ভেতরই সেলিম আল দীন বা ঢাকা থিয়েটার-এর লোকায়ত নাট্যের শিল্প কৌশল আহরণের কাজটি সীমাবদ্ধ থাকেনি, তাঁরা এক পর্যায়ে হাকিম আলী গায়েন ও তাঁর দলকে ঢাকায় এনে তাঁদের লোকজ নাট্য পরিবেশনার প্রদর্শনীর আয়োজন করেন। যদিও সেই প্রদর্শনী নাগরিক নাট্যচর্চার কর্মী বা শিল্পরসিকদের মাঝে তেমন সাড়া ফেলেনি।[১৩] তবে সেলিম আল দীন গভীরভাবে আকৃষ্ট হয়েছিলেন হাকিম আলী গায়েন-এর লোকায়ত নাট্য উপস্থাপনের দক্ষতা আর শিল্পভঙ্গির প্রতি। *চাকা* নাটকের প্রকাশিত পাণ্ডুলিপির শুরুতেই সেলিম আল দীন শ্রদ্ধা ভরে স্মরণ করেন হাকিম আলী গায়েন-এর শিল্প সত্তাকে, যখন তিনি চলে গেছেন জীবন নদীর ওপারে:

> এই নাট্যকথামালার রচয়িতা স্মরণ করে জামশা গ্রামের অমর অভিনেতা জান্নাতবাসী হাকিম আলী গায়েনকে* যমুনার শাখা নদী কালীগঙ্গার কূলে জন্ম বলে প্রবাহে প্রবাহে তিনি সে নদীর সমান বিশাল* এই নাট্যকথা তাঁরই মৃত্যু উত্তর বিমূর্ত নৃত্যচ্ছন্দের অভিজ্ঞানস্বরূপ (দীন, ১৯৯১: ৭)।।

যমুনার শাখা নদী কালিগঙ্গার প্রবাহের বিশালতার সমান কল্পনা করে এই অমর অভিনেতার বিমূর্ত নৃত্যের ছন্দকে এই নাট্যকথায় যেমন অনুসন্ধান করা হয়েছে, তেমনি ঢাকা থিয়েটার কর্তৃক এই নাট্যের মঞ্চায়নেও দেখি, হাকিম আলী গায়েন-এর আসর কেন্দ্রিক ও লোকায়ত বর্ণনাত্মক নাট্যের উপস্থাপনা ঢঙ। আর এই লোকজ ঢঙটি এই নাট্যপ্রযোজনার মঞ্চের গড়ন; অভিনেতা-অভিনেত্রীদের অভিনয়, চলন, নৃত্য-গীত, বর্ণনা, কোরিওগ্রাফি, বিন্যাস সৃজন ও পোশাকে; এবং নাটকের মূল রঙ, ধারণা ও আবহে সৃষ্টিশীল ও আধুনিক ভাবে পুনঃসৃজন করা হয়েছে। যা একই সাথে মৌলিক অথচ চিরায়ত।

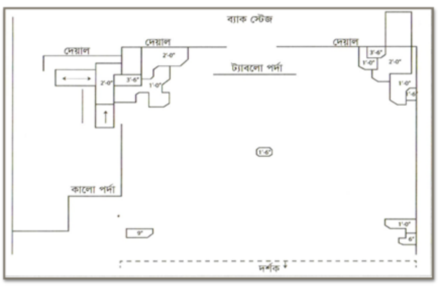

চিত্র ৪. মহিলা সমিতি মিলনায়তনে আয়োজিত *চাকা* নাট্যপ্রযোজনার অভিনয় আয়তনের ভূমিচিত্র।[১৪]

১৩. প্রবন্ধ রচয়িতার সাথে শিমূল ইউসুফের ভিডিও সাক্ষাৎকার সূত্রে জানা যায় যে, হাকিম আলী গায়েন ও তাঁর দলকে সে সময় তাঁরা (ঢাকা থিয়েটার) ঢাকায় এনে প্রায় পাঁচ ঘণ্টা ব্যাপি তাঁদের লোকায়ত উপস্থাপনার প্রদর্শনীর আয়োজন করে। সেই উপস্থাপনা ঢাকা থিয়েটারের কর্মীবৃন্দ ছাড়া অন্যান্য দলের কেউই দেখতে আসেনি। (শিমূল ইউসুফের সাক্ষাৎকার গ্রহণ কাল: জুন, ২০২৩)।

১৪. এই ভূমিচিত্র প্রাপ্তির উৎস: সৈয়দ জামিল আহমেদ। "সেলিম আল দীন রচিত এক 'ধবল রক্তিমাভ নাট্যকথামালা': উত্তর-উপনিবেশবাদ, রাজনীতি এবং প্রজন্মান্তরে বাংলাদেশের নাট্যচর্চার রূপান্তর"। পৃ. ২১।

চাকা নাটকের উপস্থাপনায় ঢাকার মহিলা সমিতির মিলনায়তনটি যেন পরিণত হয়েছিল "প্রাচীন কালের কোনো বর্ধিষ্ণু গ্রামের বড় বাড়ির উঠোনে [যেখানে] গাজীর গান বা অন্য কোনো পালা অভিনীত হওয়ার প্রস্তুতি চলছে" (আহমদ, ১৩৯৮ [বঙ্গাব্দ]: ৯১)। সত্যিকার ভাবে প্রচলিত প্রসেনিয়াম মঞ্চকে অস্বীকৃতি জানিয়ে একটি আসর সৃষ্টির প্রয়াস ছিল এ নাট্য উপস্থাপনায়। আমরা জানি মহিলা সমিতি মিলনায়তন প্রসেনিয়াম মঞ্চের আদলে গড়া একটি মিলনায়তন। কিন্তু এ নাট্য উপস্থাপনা প্রসেমিনয়াম মঞ্চ থেকে বেরিয়ে এসে মঞ্চের ঠিক উল্টোদিকে দর্শক প্রবেশের অংশ থেকে কিছুটা এগিয়ে মেলে ধরল এর নাট্য আয়তন (Performing space)। এবং এই অভিনয় আয়তনের অংশটি সাধারণত দর্শক আসন হিসেবে ব্যবহৃত হয় প্রচলিত নাট্য উপস্থাপনায়। কিন্তু প্রচলিত নাট্য উপস্থাপনার রীতিকে এক প্রকার অগ্রাহ্য করে, প্রচলিত মঞ্চের দিকে পিঠ দেখিয়ে, দর্শক আসনের প্রচলিত ব্যবস্থাকে তুলে দিয়ে আসরের মতো করে আয়োজিত হলো এই নাট্য উপস্থাপনার অভিনয় ক্রিয়ার আয়তন। যার একপাশে ছিল দর্শকাসন ব্যবস্থা। পুরো মিলনায়তনটিই যেন পরিণত হলো লোকজন নাট্যিক আয়তনের প্রণোদনায় নির্মিত এক আধুনিক নিরীক্ষাধর্মী নাট্যিক আয়তনে। পঞ্চাশ ফুট প্রশস্ত এবং পঁয়ত্রিশ ফুট গভীর আয়তনের অভিনয় এলাকাটি ছিল মূলত নিরাভরণ একটি আয়তন।[১৫] তবে স্থানে স্থানে অভিনয় এলাকা জুড়ে খড় ও খড়ের গুচ্ছ এমন ভাবে বিছানো ছিল যাতে গ্রামীণ জীবনের আবহ নির্মিত হয়েছে খড়ের আঁকা-বাঁকা চলনসহ। খড়ের এই এলোমেলো বিন্যাসের ফাঁক গলে ভেসে উঠছিল মঞ্চের পাঁচটি অংশ জুড়ে ছোট বড় র‍্যাম্প/প্ল্যাটফর্ম (চিত্র ৪)। আয়তকার ও চতর্ভূজাকৃতির বিভিন্ন মাপের এই র‍্যাম্পগুলো রাখা হয়েছিল মঞ্চের চার কোণে এবং একটি আয়তকার র‍্যাম্প ছিল মঞ্চের মধ্যবর্তী স্থানে। সমতল ভূমির অভিনয় এলাকায় এই প্ল্যাটফর্মগুলোর সংযোজন বর্ণনাত্মক নাট্যে অভিনেতা-অভিনেত্রীদের বিভিন্ন উচ্চতার চলন ও নানা বিন্যাস সৃষ্টির ক্ষেত্রে সহায়ক হয়েছে। উদারণস্বরূপ বলা যায়, নদী পারাপারের দৃশ্যটিতে ব্যাক স্টেজের বাঁ পাশের গুচ্ছ প্ল্যাটফর্মে বসেই সমগ্র আয়তনটিকে অভিনয়ের গুণে গুদারার চালাঘরে বসা কড়ি আদায় করা নিস্পৃহ চরিত্রে পরিণত করে অভিনেতা (চিত্র ৫)। তবে তাঁর হাতে মিনিমাম প্রপস্ হিসেবে থাকে একটি বাঁশের কঞ্চি। এভাবে এই প্ল্যাটফর্মগুলো অভিনেতা-অভিনেত্রী, কিংবা কথকের বর্ণনা, কথা, অভিনয় আর গানের ব্যবহারে রূপান্তরিত হয় নাট্যিক ঘটনার নানা অবয়ব আর পরিবেশে।

চিত্র ৫. *চাকা* নাট্যে প্ল্যাটফর্মের ওপর বসে একটি বাঁশের কঞ্চি ব্যবহার করে সমগ্র নাট্যিক আয়তনকে অভিনেতা উন্নীত করে গুদারার পরিবেশে। সামনের সহ-অভিনেতাও অভিনয়ের গুণে এক কুষ্ঠ রোগীর ভূমিকায় অবতীর্ণ হয় সহজেই, যে একসময় ছিল দস্যু (চিত্র প্রাপ্তির উৎস: প্রবন্ধ রচয়িতার ব্যক্তিগত সংগ্রহ)।

১৫. মঞ্চের এই মাপ সংগৃহীত হয়েছে নিম্নোক্ত রচনা থেকে:

- সৈয়দ জামিল আহমেদ। "সেলিম আল দীন রচিত এক 'ধবল রক্তিমাভ নাট্যকথামালা': উত্তর-উপনিবেশবাদ, রাজনীতি এবং প্রজন্মান্তরে বাংলাদেশের নাট্যচর্চার রূপান্তর"। পৃ. ২০।

চিত্র ৬. *চাকা* নাট্যে ন্যূনতম প্রপস্-এর ব্যবহার, আলোক সম্পাত ও অভিনেতা-অভিনেত্রীদের বিন্যাসের ভেতর দিয়ে এলংজনি হাসপাতালের আবহ নির্মাণ (চিত্র প্রাপ্তির উৎস: প্রবন্ধ রচয়িতার ব্যক্তিগত সংগ্রহ)।

অভিনয় আয়তনের পেছনটি (মাঝখানের জায়গাকে ফাঁকা রেখে) ঢাকা ছিল নারকেল পাতা দিয়ে তৈরি দুটি ভাগে বিভক্ত দেয়াল/আবরণ দিয়ে। এই আবরণদ্বয়ের কিছুটা সামনে – মাঝখানের জায়গায় একটা ঝুলন্ত পর্দা ছিল। এই পর্দাটিকে উঠিয়ে নামিয়ে পেছনের অংশে মুহূর্তেই নির্মাণ করা হতো নানা কম্পোজিশন। এ প্রসঙ্গে এলংজনি হাসপাতালের উন্মোচন দৃশ্যের প্রসঙ্গ উল্লেখ্য। প্রাণ রক্ষাকারী হাসপাতালের পরিবর্তে জীর্ণতা, ক্ষয়, অনিয়ম আর প্রায় প্রাগৈতিহাসিক চিকিৎসা পদ্ধতির প্রতিভূ এলংজনি হাসাপাতালের এক প্রাণহরণকারী আদল যেন আমাদের সামনে আবির্ভূত হয় – যখন মাঝের পর্দাটি উপরে উঠিয়ে প্রথম দেখানো হয় এই সরকারি হাসপাতালটিকে (চিত্র ৬)। নানা স্তরের কাপড়ের ফাঁকে অভিনেতা-অভিনেত্রীদের ঝুলে থাকা হাত ও মস্তকগুলোর ওপর পড়া নীচ থেকে উপরমুখা ফুট লাইটের আলো এক অশরীরী পরিবেশ সৃষ্টি করে, যেখানে মৃত্যুই যেন কাঙ্ক্ষিত। আর এই কম্পোজিশনের সর্বোচ্চ স্থানে ধবল রোগী ডাক্তার-এর আবির্ভাবে ঈশ্বর-এর ধারণা প্রণোদিত হয়। কারণ এই ডাক্তার হাসপাতালের কর্মচারীরের কাছে ঈশ্বরতুল্য। এভাবে এই নাট্য প্রযোজনার নিরাভরণ মঞ্চে অনেক ক্ষেত্রেই সামান্য মঞ্চ উপকরণ ব্যবহার করে অভূতপূর্ব সব কম্পোজিশন সৃষ্টি করা হয়েছে, যাতে বাস্তবের নানা ধারণার ইঙ্গিত থাকলেও তা বাস্তবানুগ নয়। ইঙ্গিতের ভেতর দিয়ে দর্শকের কল্পনার স্ফূরণ ঘটানোর এই প্রয়াস লোকজ নাট্যাঙ্গিকের প্রাণ। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের কণ্ঠেও প্রাচ্যদেশীয় মঞ্চ ভাবনা প্রসূত কল্পনা সৃষ্টির প্রবণতাটি সমর্থিত হয়েছে, অবিকল দৃশ্য নির্মাণের পরিবর্তে: "ভাবুকের চিত্তের মধ্যে রঙ্গমঞ্চ আছে, সে রঙ্গমঞ্চে স্থানাভাব নাই। সেখানে জাদুকরের হাতে দৃশ্যপট আপনি রচিত হইতে থাকে। সেই মঞ্চ, সেই পটই নাট্যকারের লক্ষ্যস্থল, কোনো কৃত্রিম মঞ্চ ও কৃত্রিম পট কবিকল্পনার উপযুক্ত হইতে পারে না" (ঠাকুর, ১৪০২ [বঙ্গাব্দ]: ৬৮০)।

চাকা নাট্যেও অভিনয় এবং দৃশ্যনির্মাণে এই কল্পনা সৃষ্টির এক অবিরল আর সারল্য মাখা ক্রিয়া আমরা প্রত্যক্ষ করি। এ কারণেই ষাঁড়ের লড়াই, হাঁসের জলকেলি, মৌমাছির চলন আর পুতুল নাচের দৃশ্য সৃজনে অভিনেতা-অভিনেত্রীদের শারীরিক ভঙ্গিমা, কণ্ঠে প্রযুক্ত গান আর নৃত্যছন্দ সহজেই দৃশ্যগুলোকে দর্শকের কল্পনায় বাঙ্ময় করে তোলে। যেখানে চলে "কতক তুমি [অভিনেতা-অভিনেত্রী]

বোঝাইবে, কতক তাহারা [দর্শক] বুঝিবে (প্রাগুক্ত)"-এর খেলা। এ নাটকের অভিনয়ে ছিল মোট ২০ জন অভিনেতা-অভিনেত্রী, যাদের ভেতর ১৭ জনকে অভিনেতা ও ৩ জনকে সংগীতশিল্পী হিসেবে উল্লেখ করেছেন নির্দেশক তাঁর লেখায় (আহমেদ, ২০২২: ১৯)। তবে এভাবে আলাদা করে সংগীত শিল্পীর চিহ্নায়ন স্পষ্ট হয়ে ওঠে না নাট্য পরিবেশনায়। পুরো নাটকটিকেই তাঁরা সমবেতভাবে নৃত্য, গীত, কথন আর অভিনয়ের ভেতর দিয়ে এমনভাবে এগিয়ে নিয়ে যায়, যেখানে একটি সমষ্টিগত পরিবেশনাই দর্শকের কাছে মুখ্য হয়ে ওঠে।

এই নাট্যের অভিনেতা-অভিনেত্রীগণের মাঝে অভিজ্ঞ ও নবীন – দুই গোত্রের উপস্থিতি ঘটেছে। শিমূল ইউসুফ (কথক, গরুর গাড়ির মিস্ত্রি, চাচি, গাড়িওয়ালা, লাশ-এর ভূমিকায় রূপদানকারী অভিনেত্রী) এবং রাইসুল ইসলাম আসাদ (বাহের গাড়োয়ান-এর ভূমিকায় অবতীর্ণ হওয়া অভিনেতা) এ দুজনেরই ছিল দীর্ঘ সময়ের মঞ্চ অভিজ্ঞতা। এ ছাড়া সংগীত শিল্পী ও সুরকার হিসেবে বিভিন্ন মাধ্যমে ছিল শিমূল ইউসুফের কাজের অভিজ্ঞতা। আর রাইসুল ইসলাম আসাদ তখন মঞ্চ, টেলিভিশন ও চলচ্চিত্রের একজন প্রথম সারির অভিনেতা হিসেবে সুপ্রতিষ্ঠিত। অন্যান্য অভিনেতাদের মাঝে কৌশিক সাহা (প্রৌঢ় চরিত্রে রূপদানকারী অভিনেতা), ফারুক আহমেদ (অর্শরোগী ডাক্তার, হেড মাস্টার, দিনমজুর, সিনসাদুম চরিত্রে রূপদানকারী অভিনেতা), মোস্তাগিসুর রহমান বাবু (ধরমরাজ চরিত্র রূপায়ণকারী অভিনেতা), শহিদুজ্জামান সেলিম (গুদারার ভাড়া আদায়কারী, হোসেনালী, বৃদ্ধ, বোয়াল চরিত্রে আবির্ভূত অভিনেতা), কামাল বায়োজীদ (শ্বেতীরোগী ডাক্তার, পাখি শিকারী, গ্রামের যুবক, প্যান্টপরা যুবক, কাছিম, বাজর শ্রমিক চরিত্রে রূপদানকারী অভিনেতা) সহ প্রমুখের ছিল এই দলে কাজের অপেক্ষাকৃত দীর্ঘ সময়ের অভিজ্ঞতা বাকী অন্যান্য অভিনেতা-অভিনেত্রীদের তুলনায়। এদের প্রায় সকলেরই অন্যান্য পেশায় সম্পৃক্ততা থাকার কারণে সকল কর্মদিবসে প্রযোজনাটির মহড়া সময় ছিল সন্ধ্যার পর, আর ছুটির দিনে প্রায় সারাদিনই মহড়া চলত। উল্লেখ্য, অভিনেতা-অভিনেত্রীদের মাঝে অনেকেই ছিল শিক্ষার্থী। লক্ষণীয় এঁরা অধিকাংশই পেশাদার নাট্যকর্মী না হওয়া সত্ত্বেও প্রযোজনাটির কাজে এঁদের নিষ্ঠা ও একাগ্রতায় *চাকা* নাট্যের অভিনয় কিংবা সামগ্রিক রূপে প্রতিভাত হয়েছে পেশাদারিত্ব।

নির্দেশক জামিল আহমেদ *চাকা* নাট্যের অভিনেতা-অভিনেত্রীদের 'একই জৈবিক প্রজন্মের' অন্তর্ভূক্ত হিসেবে উল্লেখ করেন – যাঁদের অনেকেরই ছিল মুক্তিযুদ্ধ দেখা এবং যুদ্ধে অংশ নেয়ার অভিজ্ঞতা। এ প্রসঙ্গে তিনি বলেন: "তারা এমন একটি প্রজন্মের অন্তর্গত যারা ১৯৭১ সালে 'অভিজ্ঞতাহীন' গেরিলা হিসেবে যুদ্ধ করেছিলেন, পেশাদার যোদ্ধা হিসেবে নয়" (প্রাগুক্ত: ২২)। উল্লেখ্য মুক্তিযুদ্ধ ছিল জনযুদ্ধ। এই জনযুদ্ধে বাংলাদেশের সর্বস্তরের সাধারণ মানুষ ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে অংশ নিয়েছে স্বতঃস্ফূর্তভাবে। যুদ্ধের পূর্ব অভিজ্ঞতা না থাকা সত্ত্বেও এই যুদ্ধে দেশমাতৃকাকে রক্ষায় তাদের দৃঢ় প্রত্যয় আর আবেগদীপ্ত অংশগ্রহণে সম্ভব হয়েছিল বিজয় অর্জন। *চাকা* নাট্যেও অভিনেতা-অভিনেত্রীদের মাঝে কাজ করেছিল সেই দেশাত্মবোধের স্ফুরণ ও মুক্তিযুদ্ধের চেতনাকে পুনর্জাগরণের গভীর অঙ্গীকার। কারণ ১৯৭৫ সাল পরবর্তী সময় থেকে বাংলাদেশের রাষ্ট্রীয় ক্ষমতায় স্বৈরাচারী সামরিক সরকারের অধীষ্ঠান এবং এ সময়ে প্রায় রাষ্ট্রীয় ইন্ধনে চলে মুক্তিযুদ্ধের চেতনা ও ইতিহাসকে বিস্মরণের কূটকৌশল। সুতরাং *চাকা* নাট্যের অভিপ্রায়ে ছিল এক গভীর রাজনৈতিক চেতনা, যা একই সাথে সদ্য উৎখাত হওয়া স্বৈরাচারী শাসকের সমালোচনাকে হাজির করেছিল, পাশাপাশি ছিল ইতিহাসের দায়বদ্ধতাকে প্রতিপালনের এক তীব্র শপথ। শিমূল ইউসুফ ও রাইসুল ইসলাম আসাদ সহ এ নাট্যের অনেক অভিনেতা-অভিনেত্রী নাটকের কেন্দ্রীয় চরিত্র লাশটিকে মুক্তিযুদ্ধের অজ্ঞাত কোনো শহীদের লাশ হিসেবে কল্পনা করেছেন। এ নাট্যে অপঘাতে নিহত হোসেনালীর লাশ এবং মৃতের প্রতি জীবিতের অনীহা – অভিনেতা-অভিনেত্রীদের মাঝে মুক্তিযুদ্ধে নিহত শহীদদের বিস্মরণের বেদনাকে জাগিয়ে তুলেছিল। একই সাথে, নব্বই-এর গণঅভ্যুত্থানে নাম না জানা অসংখ্য শহীদের আত্মদান

এবং রাষ্ট্র ও সমাজ কর্তৃক তাঁদের যথাযথ মর্যাদা না দিতে পারার ব্যর্থতাও এ নাট্যের গ্রন্থিকদের দগ্ধ করেছিল। নাটকের প্রকাশিত প্রচার প্রত্রেও আমরা দেখি এ নাট্যদলের স্পষ্ট উৎসর্গ বাণী: "স্বৈরাচার বিরোধী গণআন্দোলনের মহান শহীদ নূর হোসেন সহ শত শহীদের স্মৃতির উদ্দেশে" (চিত্র ৭)।

চিত্র ৭. *চাকা* নাট্যের প্রচারপত্রের প্রচ্ছদ পাতা। এতে স্বৈরাচার বিরোধী আন্দোলনে শহীদ হওয়া নূর হোসেন সহ শত শহীদের স্মৃতির উদ্দেশে এই প্রযোজনাকে উৎসর্গের কথা বলা হয়েছে (চিত্র প্রাপ্তির উৎস: ঢাকা থিয়েটারের কর্মী, লেখক, শিক্ষক ও গবেষক ড. চৌধুরী রুবাইয়াৎ আহমেদ)।

চাকা নাট্যের অভিপ্রায়ে যেমন ছিল স্বদেশ উৎসারিত রাজনৈতিক চেতনা, তেমনি এই প্রযোজনার আদি-অন্ত্য জুড়ে ছিল দেশজ নাট্যাঙ্গিকের প্রবণতাজাত নানা উপাদানের শিল্পিত সংশ্লেষ। মূল নাটকের অনেক অংশই অনুসৃত হয়েছে এই নাট্যে। তবে মহড়া চলাকালে মূল নাটকের বিভিন্ন অংশের সংযোজন-বিয়োজন ঘটিয়েছেন নির্দেশক অভিনয়ের গতি ও ছন্দ রক্ষার স্বার্থে (আহমেদ, ২০২২: ২৪)। নাটকের রচনারীতির মাঝে সেলিম আল দীন দাঁড়ি, কমা, সেমিকোলন সহ প্রভৃতি যতিচিহ্ন ব্যবহার করেননি। এ সকল চিহ্ন ছাড়াই বাক্যগুলো অর্থ পরিস্ফুটনে স্বয়ম্ভু বলে তিনি বিবেচনা করেছেন। এ ছাড়াও তিনি ভেবেছেন যে, যতিচিহ্নের অবলুপ্তি নির্দেশক ও অভিনেতা-অভিনেত্রীদের মাঝে দিতে পারে বাক্যের অর্থ অনুধাবন ও উপস্থাপনে এক ধরনের স্বাধীনতা (দীন, ১৯৯১: ৪৫)। আগেই উল্লেখ করেছি, বর্ণনাত্মক নাট্যাভিনয় রীতির প্রতিষ্ঠায় এ নাট্যে একই অভিনেতা নানা চরিত্রে অভিনয় করেছে। আবার চরিত্রের নানা মুহূর্তের আবেগ ও মনস্তত্ত্বের ব্যাখ্যায় অভিনেতা কখনও কখনও চরিত্র থেকে বেরিয়ে কথকের ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়েছেন। পুরো নাট্যপ্রযোজনায় একজন মূল সূত্রধর ছিল – আর এই মূল কথকের ভূমিকায় অবতীর্ণ হন শিমূল ইউসুফ। আবার মূল কথকের ভূমিকা পালনের পাশাপাশি তিনি ঢুকে পড়েন নানা চরিত্রের মাঝে – উপস্থাপন করেন নারী ও পুরুষ হিসেবে চারটি চরিত্র। নিজ লিঙ্গের ধারণা ভেঙ্গেছেন অভিনেতা-অভিনেত্রীরা তাদের অভিনয়ের দক্ষতায়।

এখানে দর্শকের ওপরও যেন তাঁদের ছিল এক প্রাচ্যদেশীয় আস্থা। কারণ প্রাচ্যের গল্পকথন রীতিতে স্বর্গ-মর্ত্য-পাতাল এক পলকেই হাজির করা সম্ভব যেখানে দর্শক ও উপস্থাপনকারী অভিনেতা-অভিনেত্রীদের মাঝে থাকে এক পারস্পরিক বোঝাপড়া। আর এই বোঝাপড়া কিন্তু হুবহু বাস্তবতা সৃষ্টির দাবি করে না। বরং এই প্রক্রিয়ায় দুই দলই (অভিনেতা-অভিনেত্রী ও দর্শক) অংশগ্রহণ করে নিজ নিজ কল্পনা ও অভিজ্ঞতার আলোকে। উপস্থাপক ও অনুধাবনকারী মিলেই যেন সম্পন্ন করে নাট্যরস সৃজনের সমগ্র প্রক্রিয়াটিকে। এ প্রসঙ্গে আবারও স্মরণ করা প্রয়োজন রবীন্দ্রনাথকে। তিনি মঞ্চে অবিকল বাস্তবতা সৃষ্টিকে এক বিফল প্রক্রিয়া হিসেবে দেখেছেন যা পাশ্চাত্য থেকে ধার করা, এবং তা অবশ্য পরিহারযোগ্য হিসেবে বিবেচনা করেছেন: "বাগানকে যে অবিকল বাগান আঁকিয়াই খাড়া করিতে হইবে এবং স্ত্রীচরিত্র অকৃত্রিম স্ত্রীলোককে দিয়াই অভিনয় করাইতে হইবে, এইরূপ অত্যন্ত স্থূল বিলাতি বর্বরতা পরিহার করিবার সময় আসিয়াছে" (ঠাকুর, ১৪০২ [বঙ্গাব্দ]: ৬৮১)। *চাকা* নাট্যেও দেখি সেই বিলাতি বাস্তব রীতির বর্জন। এখানে "ক্রস-জেন্ডার" রীতিতে বিভিন্ন পুরুষ চরিত্রে দেখি নারী অভিনেত্রীর আবির্ভাব। লিঙ্গ অতিক্রমণের এই প্রয়াস মূলত বর্ণনাত্মক অভিনয়রীতি সমর্থিত। আর এই অভিনয়রীতির প্রণোদনায় নির্মিত এই প্রযোজনায় প্রাণিকূলের নানা প্রাণির রূপদানেও অভিনেতা-অভিনেত্রীদের অসুবিধায় পড়তে হয়নি। ষাঁড়, ষাঁড়ের লড়াই, খাকি রঙের কুত্তা, মৌমাছি, হাঁসের জলকেলি প্রভৃতি প্রাণিকূল-নির্ভর অভিনয় অংশে অভিনেতা-অভিনেত্রীগণ সহজেই নিজ (মনুষ্য) জীব প্রজাতির সীমা অতিক্রম করে হয়ে উঠে বিচিত্র প্রাণীকূলের অংশ।

চিত্র ৮. *চাকা* নাট্যপ্রযোজনায় এক খণ্ড কাপড় হয়ে উঠেছিল লাশের সমার্থক। বাঁশের কঞ্চিতে বাঁধা চাকা অঙ্কিত কাপড়টি নির্দেশ করেছে গরুর গাড়িকে। লাশ ও চাকা নির্দেশিত কাপড়ের টুকরোদ্বয়ে সহ অভিনেতা-অভিনেত্রীদের অগ্রসরমান শারীরিক ভাঙ্গিমায় দোলায়িত হয়েছে গরুর গাড়ির চলন (চিত্র প্রাপ্তির উৎস: প্রবন্ধ রচয়িতার ব্যক্তিগত সংগ্রহ)।

লাশের চরিত্রায়নে দেখি বর্ণনাত্মক অভিনয়রীতির শৈল্পিক ও কল্পনাপ্রবণ বিস্তৃতির প্রয়োগ। এক খণ্ড সাদা কাপড় সহজেই হয়ে উঠে লাশের সমার্থক। বাহের গাড়োয়ান যখন তার সঙ্গীদের সাথে নিয়ে লাশটি (কাপড়ের টুকরাটি) এক কাঁধে ও এক হাতে বাশের কঞ্চিতে বাঁধা চাকার ছবি যুক্ত কাপড়ের খণ্ড ধারণ করে মঞ্চের এমাথা থেকে ওমাথা পরিভ্রমণ করে, তখন সহজেই দর্শকের কল্পনায় ভেসে ওঠে গাঁয়ের পথে এ লাশ নিয়ে একটি গরুর গাড়িতে গাড়োয়ন ও পৈরাতদের পরিভ্রমণের নাট্যিক বাস্তবতা (চিত্র ৮)। এ বাস্তবতা কিন্তু তৈরি হয় দর্শকের কল্পনায়। আর এ বাস্তবতা সৃষ্টিতে অভিনেতা-

অভিনেত্রীদের বর্ণনাত্মক অভিনয় ও কিছু ইঙ্গিত নির্দেশক প্রপস্ই যথেষ্ট ছিল। মাঝে মাঝে সেই ধারণা সৃষ্টিকারী প্রপস্-এর কাঠামো পরিত্যাগ করে লাশটি আমাদের সামনে উপস্থিত হয় অভিনেত্রীর (শিমূল ইউসুফ-এর) অভিনয়ের ভেতর দিয়ে। নয়ানপুরে লাশের ঠিকানা না পেয়ে যখন তারা ক্লান্ত ও অভুক্ত অবস্থায় নবীনপুরের উদ্দেশ্যে যাত্রারত, তখন রাত্রির ঘোর অন্ধকারে বিরান ভূমির বিষণ্ন পরিবেশে হঠাৎই যেন খেঁজুর পাতার চাটাইয়ের বাঁধন ছিড়ে বেরিয়ে আসে লাশটি মানুষের অবয়বে। তারপর বাহের গাড়োয়ানের সাথে চলে তার কথোপকথন:

> [লাশ] তুমার মন খারাপ নাকি গো?
> [গাড়োয়ান] তার চে বেশি
> [লাশ] আমার শরীলটা গোরে ছেপে না দিলে শান্তি পাই না* পচন ধইরেছে গো
> [গাড়োয়ান] হামাকের সঙ্গীগণের বমি আসে তোমাকের পচা গন্ধে
> [লাশ] মোর পচাগন্ধে মোরই বমি আসতেছে
> [গাড়োয়ান] তবে বমি কর ধুয়ে মুছে দেমো
> [লাশ] কিন্তুক মোর পেট শূন্য নাড়ি ভুড়ি ফুসফুস গুর্দা পেট ফেইড়ে তার মিঝে সান্ধায়ে দিছে গো
> গাড়োয়ান হঠাৎ টের পায় সে মৃত যুবকের সঙ্গে একাই কথা বলছে* সহসা সে বিড় বিড় করে
> [গাড়োয়ান] পাগল হয়া যামু মুই পাগল হয়া যামো* চাঁদ পশ্চিমে হেলে কতরাজ্যের পার তুকে লিয়ে আমি কতদূর যামো (দীন, ১৯৯১: ৩৩)?

সত্যিকার ভাবেই নাট্য প্রযোজনায় লাশের সাথে বাহের গাড়োয়ানের এই কথপোকথনে এক পরাবাস্তব আবহ তৈরি হয়। মঞ্চের উপর থেকে প্রক্ষিপ্ত ও ছড়ানো নীল আলোয় কথা বলা লাশটি যেন দর্শকের অনুভূতিতে এক অস্বস্তি তৈরি করে। এ অস্বস্তি লাশটি দাফন না করতে পারার অপারগতা থেকে সৃষ্ট। এ লাশ যেন তাদের বোধে স্বজনের লাশের দায়ভার হিসেবে চেপে বসে। দর্শকের বোধে লাশটির প্রতি যে প্রগাঢ় আত্মিক টানের সৃষ্টি হয় – তা কিন্তু বাস্তবধর্মী পরিবেশ বা বাস্তবানুগ অভিনয় প্রক্রিয়ার ভেতর দিয়ে জন্ম নেয়নি। বরং বর্ণনাত্মক অভিনয়ের গীতলতা ও কল্পনা উদ্রেককারী সক্ষমতাই তাদের ভেতর সৃষ্টি করে এই করুণ আবেগ ও যন্ত্রণাময় অভিঘাতের।

চাকা নাট্য প্রযোজনার সংগীত পরিকল্পনায় ছিলেন শিমূল ইউসুফ। এ নাট্যের সংগীতে সুরারোপের ক্ষেত্রে, তিনি একই সাথে লোকায়ত গানের প্রচলিত সুরকে যেমন ধরতে চেষ্টা করেছেন, তেমনি নাট্যকাহিনির অন্তর্গত পরিবেশ ও মনস্তত্ত্বের প্রকাশকেও তিনি গুরুত্ব দিয়েছেন। আবার নাট্যকাহিনির সময় নির্দেশে সংগীতে তিনি প্রয়োগ করেছেন বিভিন্ন সময়ের রাগ। যেমন সকাল বেলার নির্দেশে সংগীতের সুরে এসেছে ভৈরবী রাগ। *চাকা* নাটকে (লিখিত রূপে) নির্দিষ্ট করে অনেক ক্ষেত্রেই গানের অংশ চিহ্নিত হয়নি। লেখকের লেখার ঢঙটি এমন ছিল যে, তাতে সংগীতময়তা, গদ্য ও পদ্যের এক অবিমিশ্র দোলাচাল কাজ করেছে। তাই সংগীত অংশের জন্য শিমূল ইউসুফ গদ্যে লেখা অংশগুলোকে বাছাই করেছেন অনেকটা স্বাধীনভাবে। তবে কখনও নির্দেশক, কখনও বা সহ-অভিনেতা/অভিনত্রীদের সাথে আলাপ করেও এই বাছাই পর্ব এগিয়েছে। নাটকটির বার বার পঠন (মহড়াকালে কিংবা এর বাইরে) তাঁকে সহায়তা করেছে সংগীতের জন্য নির্ধারিত অংশসমূহকে নির্দিষ্ট করার ক্ষেত্রে। উদাহরণ স্বরূপ বলা যায় যে, নাটকের শুরুর অংশটিকে তিনি বন্দনা অংশ বিবেচনা করে সুর করেছেন। তবে এ অংশে সুরের ফাঁকে ফাঁকে কোনো কোনো চরণ কথায় কিংবা বর্ণনায় উঠে এসেছে। নাটকের সমাপ্তি সংগীতেও সুর ও কথনের এই খেলা চলে:

[*সুরে গাওয়া অংশ*]	সন্ধ্যার অন্ধকারে মাছি উড়ে যায়।।
	মৃতের মুখে এসে পড়ে এই মর্ত জন্মের শেষ আলো*
	লেখা ঠিকানায় যে পরিচয় কূল পায় না
[*বর্ণনায় উচ্চারিত অংশ*]	অনিশ্চিত পথের বাঁকে সে পরিচয় নিশিথ নিবিড় হয় (দীন, ১৯৯১: ৪০)।।

পুরো নাটকের সুর নির্মিত হয়েছে মহড়ার সময়ে। এতে সুরের নানা অংশের গ্রহণ-বর্জনের কাজটিতে সবার অংশগ্রহণের এক যুথবদ্ধতাও তৈরি হওয়ার সুযোগ সৃষ্টি হয়েছে। জীবন্ত সংগীত প্রয়োগের মাধ্যমে গাওয়া ও বাজানো এই নাটকের সংগীতে বাদ্যযন্ত্রের অতটা আধিক্য ছিল না। ঢোল, মৃদঙ্গ, মন্দিরা, হারমোনিয়াম ইত্যাদি দেশজ বাদ্যযন্ত্রের বাদনে গায়কীর আবেদন সৃষ্টি করা হয় একক কিংবা মিলিত ভাবে গাওয়া গানের অংশসমূহে।

এ নাটকের পোশাকে নেই কোনো কাল, ধর্ম কিংবা শ্রেণি নির্দেশকারী বৈশিষ্ট্য। ঢাকা থিয়েটার কর্তৃক প্রকাশিত প্রচার পত্রে এ নাট্যের পোশাক পরিকল্পক হিসেবে লিখা আছে রাশেদুল হুদার নাম। শিমূল ইউসুফের সাথে কথোপকথনের সময়, তিনি জানিয়েছেন এই নাট্যের পোশাক পরিকল্পনায় অংশ নিয়েছেন তিনিও। সময়-উর্ধ্ব এক নিরপেক্ষ ভঙ্গি আছে এ নাট্যের পোশাকে। নারী-পুরুষ নির্বিশেষে এ নাট্যের অভিনেতা-অভিনেত্রীরা পোশাকের নিচের অংশে পরিধান করেছে লুঙ্গি ও ধুতির সমন্বিত রীতির এক খণ্ড বস্ত্র। অর্থাৎ এক পাশ ধুতির মতো কুচি করে পরা আর অন্য পাশ লুঙ্গি পরিধানের রীতির মতো সোজাসাপ্টা ও সাদামাটা। শরীরের উপরের অংশে মেয়েরা ব্লাউজের মতো পোশাক পরেছে। আর ছেলেদের ছিল ফতুয়ার মতো পোশাক। তবে মেয়েরা তাদের ব্লাউজের ওপর এক খণ্ড ওড়নার মতো কাপড় ব্যবহার করেছে, যাকে ক্ষেত্র বিশেষে তারা বিভিন্ন ভাবে ব্যবহার করেছে: কেউ ঘোমটা হিসেবে ব্যবহার করেছে, কেউ পিঠ থেকে কাপড়টি বুকের ওপর ঘুরিয়ে কোমরে প্যাঁচ দিয়ে পরিধান করেছে। লক্ষণীয় পোশাকের এই নিরপেক্ষতা নির্দিষ্ট ধর্ম পরিচয়ের উর্ধ্বে নিয়ে যায় চরিত্রসমূহকে। আর এই ধর্মনিরপেক্ষতা স্বৈরাচারী সরকারের আমলে চাপিয়ে দেওয়া রাষ্ট্রধর্ম 'ইসলাম'-এর পরিচয় নির্দেশকারী বৈশিষ্ট্যকেও যেন অস্বীকৃতি জানানোর এক ভঙ্গি। তবে ধরমরাজের উদাম বক্ষ ও নিচের অংশে পরিহিত লেংটিটির মাঝে 'সাঁওতাল' নৃগোষ্ঠীর নৃতাত্ত্বিক প্রবণতাকে আড়াল করা হয়নি।

ধরমরাজ লাশটিকে ধরম ঠাকুর জ্ঞান করে। লাশটিকে ঘিরে নাচের তালে তার গাওয়া 'ধরম ঠাকুর ঢাককুরাকুর' গান কিংবা তার পরিবেশন করা সাঁওতাল সৃষ্টিতত্ত্ব থেকে 'হড় হোপেনের গল্প' যেমন সাঁওতালদের একান্ত গল্পকথা থেকে নেওয়া, তেমনি ঠাকুর পূজার থনে পরিবেশন করা 'পুতুল নাচের গান' এ নাট্যে নেওয়া হয়েছে সনাতন হিন্দু ধর্ম থেকে। আবার প্রৌঢ়ের গাওয়া কারবালার পুঁথি পাঠের ভেতর দিয়ে প্রকাশিত হয়েছে মুসলিম ধর্মানুসারীদের মর্মন্তুদ ঘটনা। এভাবে নানা ধর্মের পুরাণ ও প্রচলিত কাহিনির সন্নিবেশনে এগিয়েছে গাড়োয়ানদের লাশটিসহ নানা গ্রামময় গরুর গাড়ির পরিভ্রমণ। তবে শেষ পর্যন্ত, মানব ধর্ম ও মানবতা বোধ প্রখর হয়েছে নাট্যকাহিনিতে। আর এই মানবতাবোধের দায়ভার থেকেই আমরা প্রত্যক্ষ করি, নদীর পাড়ের বালুচরে গাড়োয়ান ও তার সঙ্গীরা ঠিকানা না পাওয়া লাশটিকে স্বজনের সম্মানে দেয় শেষ শয্যা। কবরস্থ করার পর লাশের শেষ কৃত্যও তারা পালন করে নিজেদের মতো করে।

সর্বোপরি, সৈয়দ জামিল আহমেদ নির্দেশিত ঢাকা থিয়েটারের নাট্যপ্রযোজনা *চাকা* (১৯৯১) বাংলাদেশের থিয়েটার চর্চার ইতিহাসে একটি মাইলফলক প্রযোজনা। এই নাট্যপ্রযোজনায় উচ্চারিত হয়েছে উপনিবেশিক নাট্যরীতিকে অগ্রাহ্যকারী এক দ্রোহ এবং আত্মআবিষ্কারী মনোভাব। কারণ আঙ্গিকের দিক থেকে এ নাট্যপ্রযোজনা শেকড় সন্ধানী প্রবণতায় নাগরিক মঞ্চে দেশজ বর্ণনাত্মক নাট্য আঙ্গিকের প্রতিষ্ঠা ঘটিয়েছে নিরীক্ষাধর্মী উপায়ে। একই ভাবে, বিষয়ের দিক থেকে এতে উঠে এসেছে রাজনৈতিক অভিপ্রায়। যে অভিপ্রায়ে মুক্তিযুদ্ধের চেতনা যেমন প্রতিফলিত হয়েছে, তেমনি সদ্য বিগত হওয়া স্বৈরাচারী সরকারের শাসনে অসংখ্য তরুণ প্রাণের বিনাশও সমালোচিত হয়েছে এই প্রযোজনায় পরোক্ষভাবে। পথপ্রদর্শক এই প্রযোজনায় মানুষের প্রতি মানুষের ভালোবাসা ও দায়বোধের প্রতিপালনের ভেতর দিয়ে এক ন্যায্য ও সুন্দর আগামীর স্বপ্ন প্রোথিত হয়েছে। একই সাথে, এই মানবিকতার চর্চা দেশ গঠনেরও সহায়ক।

মোরশেদুল ইসলাম পরিচালিত *চাকা* (১৯৯৩) চলচ্চিত্রের নিবিড় পাঠ

সেলিম আল দীন-এর *চাকা* নাটকের কাহিনি অবলম্বনে ১৯৯৩ সালে মোরশেদুল ইসলাম পরিচালনা করেন একই শিরোনামের চলচ্চিত্র *চাকা*। সেলিম আল দীনের *চাকা* নাটকের মূল কাহিনিকে নিয়ে নির্মিত এ চলচ্চিত্র মাধ্যমগত স্বকীয়তার কারণে ভিন্ন অবয়ব প্রাপ্ত হয়েছে। এ ছাড়াও রূপান্তরের ক্ষেত্রে সেলিম আল দীনের *চাকা*কে সম্পূর্ণরূপে গ্রহণ করেননি পরিচালক। গ্রহণ-বর্জনের এ প্রক্রিয়া যে কোনো রূপান্তরের বেলাতেই চলে, আর তা নিয়ে নেই স্বতঃসিদ্ধ কোনো নিয়ম। বরং উৎস মাধ্যম বা সাহিত্য থেকে যে গল্পটি নেওয়া হয় চলচ্চিত্রে রূপ দেবার জন্য, তাকে চলচ্চিত্র তাত্ত্বিক Bela Balazs দেখেছেন নিছক "raw material" হিসেবে (Balazs, 1953: 263)। তিনি আরও বলেন যে, নিজ মাধ্যমের প্রয়োজনে সেই উৎস মাধ্যমের প্রতি পরিচালকের তেমন মনোযোগী না হলেও চলবে, যদিও সেই মাধ্যমে থেকেই নেওয়া হয়েছে তাঁর চলচ্চিত্র মাধ্যমের মূল উপাদান।[১৬] সেলিম আল দীনের বর্ণনাত্মক রীতির নাটকে রয়েছে কথা ও সুরের প্রাধান্য। তাৎক্ষণিক ভাবে সৃষ্ট মাধ্যম থিয়েটার অর্থাৎ নাট্যপরিবেশনার জন্য এ বর্ণনাত্মক রীতির রয়েছে যথেষ্ট আবেদন এতদঞ্চলে। কারণ বাঙালির হাজার বছরের নাট্যরীতির ধারাটাই এমন – এ নাট্য নৃত্য-গীতনির্ভর, বর্ণনাত্মক ও কথামুখর। অন্যদিকে চলচ্চিত্রের ভাষা হচ্ছে চিত্ররূপের ভাষা। এ মাধ্যমের ভাষা বাঙ্ময় হয় চিত্রদৃশ্য ধারণ ও সম্পাদনার কৌশলে। বিশ্বখ্যাত উপমহাদেশীয় চলচ্চিত্র পরিচালক সত্যজিৎ রায়কে এ কারণেই বলতে শুনি: "ছবির কাহিনির নাট্যরস প্রধানত ক্যামেরা ও এডিটিং-এর বিশেষ ব্যবহারেই ফুটে ওঠে; তার জন্য অভিনয় বা সংলাপকে নাটকের সুরে বাঁধার কোন প্রয়োজন নেই" (রায়, ২০১৯: ১৪)। সুতরাং মোরশেদুল ইসলামের চলচ্চিত্র *চাকা*র শিল্পভঙ্গি অন্বেষণে মূল মাধ্যম *চাকা* নাটককে বার বার চোখের সামনে হাজির করাটাও ততটা যুক্তি সঙ্গত নয়। তা সত্ত্বেও *চাকা* চলচ্চিত্রের এই নিবিড় পাঠে আমরা দুই মাধ্যমে *চাকা*র নানা প্রসঙ্গ যেমন আলোচনা করব, তেমনি চলচ্চিত্র মাধ্যমের নন্দনতত্ত্ব ও ভাষার প্রবণতার ওপর ভিত্তি করে *চাকা* চলচ্চিত্রের বিশ্লেষণ গুরুত্ব পাবে অধিক। একই সাথে, পরিচালক হিসেবে মোরশেদুল ইসলামের চিন্তা, দর্শন, বেড়ে ওঠা এবং চলচ্চিত্র নির্মাণ ভঙ্গিও গুরুত্ব পাবে এই পর্যালোচনায়।

চলচ্চিত্র নির্মাণে মোরশেদুল ইসলামের আবির্ভাব চলচ্চিত্র সংসদ আন্দোলনের মধ্য দিয়ে। এদেশে স্বাধীনতা পূর্ববর্তী সময়ে চলচ্চিত্র সংসদ আন্দোলনের সূচনা হলেও এই আন্দোলন বেগবান হয় ১৯৭০ ও ১৯৮০-এর দশকে। পৃথিবীর বিখ্যাত নানা চলচ্চিত্র প্রদর্শনের পাশাপাশি কর্মীদের জন্য বিভিন্ন মেয়াদে চলচ্চিত্রের বিভিন্ন দিকের ওপর তত্ত্বীয় ও ব্যবহারিক কোর্স (Film appreciation course) আয়োজন এবং চলচ্চিত্র বিষয়ক প্রকাশনাসহ চলচ্চিত্র সংশ্লিষ্ট নানা কাজের মধ্য দিয়ে চলচ্চিত্র সংসদ আন্দোলনের কর্মীদের মাঝে গড়ে ওঠে চলচ্চিত্রের জ্ঞান ও চলচ্চিত্র নির্মাণের প্রেরণা। পরবর্তী সময়ে, মধ্য আশির দশকে বাংলাদেশে 'বিকল্প ধারার চলচ্চিত্র আন্দোলন'-এর সূচনা হয় চলচ্চিত্র সংসদ আন্দোলনের তরুণ কর্মীদের হাতে। এঁদের মাঝে তারেক মাসুদ, তানভীর মোকাম্মেল, মোরশেদুল ইসলাম, শামীম আখতার প্রমুখের নাম উল্লেখযোগ্য। বিকল্প ধারার এই চলচ্চিত্র আন্দোলন 'স্বল্প দৈর্ঘ্য চলচ্চিত্র আন্দোলন' নামেও পরিচিতি লাভ করে। কম খরচে ১৬ মিলিমিটার ফরমেট-এর ক্যামেরা দিয়ে ছোট দৈর্ঘ্যের কাহিনি বা তথ্যচিত্র নির্মাণের মধ্য দিয়ে শুরু হয় এই চলচ্চিত্র নির্মাণ

---

১৬. "a film script writer adapting the play may use the existing work of art merely as raw material, regard it from the specific angle of his own art form as it were raw reality, and pay no attention to the form once already given to the material" –Bela Balazs, *Theory of the Film*, 263.

প্রক্রিয়া। স্বল্প দৈর্ঘ্যের চলচ্চিত্র দিয়ে এই চলচ্চিত্র পরিচালকদের কাজের শুরু হলেও, এই চলচ্চিত্র নির্মাতারা সৃষ্টি করেন অনেক দীর্ঘ ব্যাপ্তির চলচ্চিত্র, যা বাংলাদেশের চলচ্চিত্রের ইতিহাসে দখল করে আছে বিশেষ স্থান। মূলধারার প্রচলিত বাণিজ্যিক সিনেমার কাঠামো ও নির্মাণের ধারাকে এড়িয়ে দেশ, দেশের রাজনীতি, ইতিহাস, ঐতিহ্য ও গ্রামীণ জীবন মুখ্য হয়ে ওঠে এঁদের চলচ্চিত্রে। প্রবন্ধ রচয়িতা তাঁর অন্য একটি প্রবন্ধে তৃতীয় বিশ্বের এই ধরনের স্বাধীন ধারার চলচ্চিত্রসমূহের প্রবণতা বিশ্লেষণে উল্লেখ করেন: "The independent films of Bangladesh as Third World Cinema are mostly concentrated on the shaping of national identities of Bangladesh through their depiction of history, myths, traditions, and memories" (Akhter. 2019: 1–19). সর্বোপরি, জাতীয় চলচ্চিত্রের একটি ভিত্তি নির্মাণের প্রয়াস পরিলক্ষিত হয় এই তরুণ নির্মাতাদের কাজে। বলা হয়ে থাকে, বাংলাদেশের বিকল্প ধারার চলচ্চিত্র আন্দোলনের প্রথম চলচ্চিত্র *আগামী* (১৯৮৪), যার পরিচালক ছিলেন মোরশেদুল ইসলাম। স্বল্পদৈর্ঘ্যের চলচ্চিত্র আন্দোলন সৃষ্ট চলচ্চিত্রগুলোর মাঝে *আগামী*ই প্রথম লাভ করে বহির্বিশ্বের স্বীকৃতি – ভারতের 'সিলভার পিকক' পুরস্কার। আর এ কারণেও অনেক বিকল্প চলচ্চিত্র নির্মাতাদের মাঝে এ সময় থেকে জন্মায় আন্তর্জাতিক খ্যাতির মোহ (হোসেন, ২০১৯: ৭৮)। এই চলচ্চিত্র মুক্তিযুদ্ধের প্রেরণায় নির্মিত। স্বৈরাচারী সরকারের আমলে মুক্তিযোদ্ধাদের নিগ্রহের চিত্র প্রতীকী ব্যঞ্জনায় অত্যন্ত সাহসের সাথে তুলে আনা হয়েছে এতে। সুতরাং পরিচালক হিসেবে মোরশেদুল ইসলামের মাঝে ছিল এক ধরনের রাজনৈতিক অঙ্গীকার, যা একই সাথে স্বৈরাচার সরকার ও প্রচলিত বাণিজ্যিক চলচ্চিত্রের কাঠামোকে অস্বীকৃতি জানানোর প্রত্যয়ে দীপ্ত।

সেলিম আল দীনের *চাকা* নাটকটি ঢাকা থিয়েটার যখন মঞ্চে আনে তখনই *চাকা* দেখার অভিজ্ঞতা হয় পরিচালক মোরশেদুল ইসলামের।[১৭] নাটকটির মাঝে নিহিত মানবিক আবেদন তাঁকে বেশ নাড়া দেয়। পর পর কয়েকবার দেখে ফেলেন তিনি মঞ্চ নাটক *চাকা*। এর পরই তিনি সিদ্ধান্ত নেন *চাকা*কে চলচ্চিত্রে রূপদানের। তবে মঞ্চ নাটকের আঙ্গিকটিকে তিনি অনুসরণ করেননি। *চাকা*র মূল কাহিনিকে ঠিক রেখে অর্থাৎ মৃতের সৎকারে জীবিতের (গাড়োয়ানদ্বয়ের) দায়বদ্ধতার দিকটিকে অক্ষুণ্ন রেখে তিনি নাট্যকাহিনির নানা যোজন-বিয়োজন ঘটালেন এর চলচ্চিত্রায়নের ক্ষেত্রে। এ প্রসঙ্গে তাঁর উক্তি:

> আমি যখন ভাবলাম এটা [*চাকা* নাটক] চলচ্চিত্রে [নির্মাণ করবো], তখন কিন্তু একেবারেই ওটার খোল নলচে পাল্টে ফেলতে হল। মানে কাহিনি একই। কিন্তু কাহিনি বলার ভঙ্গি আমাকে চলচ্চিত্রের ভাষায় বলতে হচ্ছে। সুতরাং আমি একেবারেই সেই দিক থেকে স্বাধীনতা নিলাম। এবং বিষয়বস্তুর দিক থেকেও [...] কাহিনির কিছু কিছু জায়গায় আমি কিছু নতুন জিনিস ঢোকালাম। যেমন ঐখানে একটা গণআন্দোলনে নিহত একজন যুবকের লাশের ইঙ্গিত ছিল। আমার চলচ্চিত্রে কিন্তু সেটা ছিল না। আমার কাছে মনে হয়েছে যে, এটা যে কারুর লাশ হতে পারে, এটা একজন মানুষের লাশ। এটি হচ্ছে এর আসল পরিচয়।[১৮]

১৭. "সেলিম আল দীন-এর সৃষ্টির চলচ্চিত্রায়ন" শীর্ষক ওয়েবিনারে মোরশেদুল ইসলামের প্রদত্ত সাক্ষাৎকার থেকে প্রাপ্ত তথ্য। ওয়েবিনার সঞ্চালনা করেন অত্র প্রবন্ধের রচয়িতা। ওয়েবিনারটি অনুষ্ঠিত হবার তারিখ: ১৮ আগস্ট, ২০২১। এর ইউটিউব লিংক: https://www.youtube.com/watch?v=y4Y3NodaRUk। (লিংকে প্রবেশের তারিখ: ১ জুন, ২০২৩)।

১৮. প্রাগুক্ত। (উল্লেখ্য, সাক্ষাৎকারের অংশটি কোথাও শব্দগত দিক থেকে আংশিক পরিমার্জনা করা হয়েছে বলার ভাষাকে লেখনীতে রূপান্তরের তাগিদে।)

মোরশেদুল ইসলামের মতো রাজনৈতিক সচেতন এক চলচ্চিত্র নির্মাতা এ চলচ্চিত্রের লাশটিকে সাধারণ একজন মানুষের লাশ হিসেবে দেখালেও তিনি কিন্তু ভোলেননি লাশটিকে ঘিরে সাম্প্রদায়িক রাজনীতির সূক্ষ্ম ইঙ্গিত উপস্থাপনে। সাধারণ মানুষের প্রত্যাখানের পাশাপাশি লাশটির দাফনে ধর্মও যে এগিয়ে আসেনি – সেই বিষয়টিকে তিনি চলচ্চিত্রের অন্যতম দ্বন্দ্ব হিসেবে দেখিয়েছেন। লক্ষণীয়, এ চলচ্চিত্রের প্রকাশিত প্রচারপত্রের সম্মুখ পাতার তিনটি স্থিরচিত্রের ভেতর গুরুত্ব নিয়ে মধ্যবর্তী অংশে আছে ইমাম কর্তৃক লাশ দাফনের প্রস্তাব প্রত্যাখানের স্থিরচিত্র (চিত্র ৯)। আর চলচ্চিত্রে এ ধরনের বিষয় প্রয়োগের প্রবণতাকে অনেকেই বলেছেন 'সস্তা পদ্ধতি' হিসেবে। মোহাম্মদ আজম এ প্রসঙ্গে বলেন: "ঢাকাই সংস্কৃতিতে এ ধরনের চরিত্র [ইমাম সাহেবের চরিত্র] দিয়ে চটজলদি 'মানবিকতা', 'প্রগতিশীলতা' ইত্যাদি মাপার যে সস্তা পদ্ধতি আছে, মোরশেদুল ইসলাম নিশ্চয়ই তা দ্বারা প্রভাবিত হয়েছেন" (আজম, ২০১৯: ৩৮)। এ প্রসঙ্গে লুৎফর রহমানের মন্তব্য: "সাম্প্রদায়িক মনোবৃত্তিটি প্রদর্শনই চলচ্চিত্রকারের উদ্দেশ্যের কেন্দ্রবিন্দু ছিল। এতদ্ব্যতীত অন্য কোন দার্শনিক অভিপ্রায় দর্শক চিত্তকে আলোড়িত করে না" (রহমান, ২০০৮: ৫৪)। চলচ্চিত্রে সাম্প্রদায়িক এই বিষয়ের সংযোগ সত্যিকার ভাবেই তেমন দার্শনিক অভিপ্রায়কে জাগিয়ে না তুললেও এ ধারণার কাঙ্ক্ষিত দর্শক যে পাশ্চাত্যের দর্শক – সেই সন্দেহকে একেবারে উড়িয়ে দেয়া যায় না। চীনা Fifth Generation চলচ্চিত্র নির্মাতাদের মতো বাংলাদেশের বিকল্প ধারার চলচ্চিত্র পরিচালকগণ শহুরে ও পশ্চিমা দর্শকদের মনোযোগ আকর্ষণের জন্য যেমন বাংলাদেশের গ্রামীণ ঐতিহ্যকে চলচ্চিত্রে তুলে ধরেছেন, আবার কখনও নিজ দেশের অন্ধকারাচ্ছন্ন বিষয়গুলোকে তুলে এনেছেন তাঁরা (Akhter, 2014: 63-64)। অনেক ক্ষেত্রেই, এ ধরনের চিত্রায়ণ বিদেশি চলচ্চিত্র উৎসবে স্বীকৃতি এনে দেয়। এভাবে উদ্দেশ্যমূলক ভাবে অতীত ঐতিহ্য কিংবা বর্তমান বঞ্চনার চিত্র চলচ্চিত্রে তুলে ধরার প্রবণতাকে সংস্কৃতি বিষয়ক গবেষক Rey Chow দেখেছেন 'primitive passion' হিসেবে (Chow, 1995: 21)। বাংলা করলে এর অর্থ দাঁড়ায় 'আদিমতার প্রতি মোহগ্রস্ততা'। তিনি চীনা পঞ্চম প্রজন্মের চলচ্চিত্র নির্মাতাদের চলচ্চিত্রের এক সাধারণ বৈশিষ্ট্য আলোচনা প্রসঙ্গে দেখিয়েছেন যে, তাঁরা কখনো কখনো বহির্বিশ্বে নিজ দেশের self-exoticisation-এর চিত্র তুলে ধরার উদ্দেশ্যে নারীর প্রতি নিপীড়ন, দারিদ্র্য ও কুসংস্কার ইত্যাদির চিত্রায়ণ হাজির করেন তাঁদের চলচ্চিত্রে। আর এই কৌশলকে তিনি উল্লেখ করেছেন 'oriental's orientalism' হিসেবে (Chow, 1995: 171)। এটা অনেকটা পশ্চিমাদের চোখে যারা প্রাচ্যদেশীয় অবহেলিত, তাদের দ্বারা অধিক অবহেলা চিত্রায়ণের সামিল। সুতরাং লক্ষণীয় সেলিম আল দীনের নাটকে সাম্প্রদায়িক মনোবৃত্তির প্রসঙ্গ না থাকলেও এ প্রসঙ্গ মোরশেদুল ইসলাম তাঁর *চাকা* চলচ্চিত্রের কেন্দ্রীয় বিষয় হিসেবে সংযুক্ত করেন যেন সেই 'oriental's orientalism' এর প্রবণতায় পশ্চিমা দর্শকের মনোযোগ আকর্ষণের নিমিত্তে।

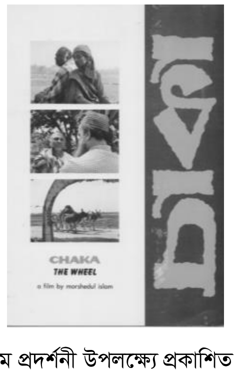

চিত্র ৯. *চাকা* চলচ্চিত্রের প্রথম প্রদর্শনী উপলক্ষ্যে প্রকাশিত প্রচার পত্রের সম্মুখ পাতা
(চিত্র প্রাপ্তির উৎস: *চাকা* চলচ্চিত্রের পরিচালক জনাব মোরশেদুল ইসলাম)।

চাকা চলচ্চিত্রটি বাংলাদেশের কোনো প্রচলিত প্রেক্ষাগৃহে প্রদর্শিত হয়নি। তবে বিকল্প ধারার চলচ্চিত্র পরিচালকের এই চলচ্চিত্র প্রদর্শিত হয়েছে বিকল্প পদ্ধতিতে। পাবলিক লাইব্রেরি মিলনায়তন কিংবা বিভিন্ন বিদেশি দূতাবাসে এই চলচ্চিত্র প্রদর্শিত হয়। ঢাকার বাইরেও এর প্রদর্শন হয় বিভিন্ন সময়ে। প্রদর্শনকালে পরিচালকের বন্ধু ও সহযোদ্ধারা যেমন সহায়তা করেছেন, তেমনি তাঁর অংশগ্রহণ ও নেতৃত্বে গড়ে ওঠা চলচ্চিত্র সংসদ 'চলচ্চিত্রম চলচ্চিত্র সংসদ' -এর কর্মীরাও এগিয়ে আসে এই চলচ্চিত্রের প্রদর্শন সংশ্লিষ্ট নানা কর্মযজ্ঞে। বস্তুত, বিকল্প ধারার অন্যান্য পরিচালকদের চলচ্চিত্র প্রদর্শনের ক্ষেত্রেও প্রচলিত ছিল – এই বিকল্প রীতির প্রদর্শন ব্যবস্থা, যেখানে কাজ করত পরিচালকের বন্ধু ও সহযোদ্ধা শ্রেণির মানুষজন স্ব-উদ্যোগে, বিনা পারিশ্রমিকে। নির্মাণের বিভিন্ন পর্যায়েও দৃশ্যমান হতো এই যূথবদ্ধতা। মোরশেদুল ইসলামের এই চলচ্চিত্র নির্মাণের অর্থ যুগিয়েছিলেন তাঁর বন্ধু সৈয়দ রফিকুর রহিম (বিপ্লব, ২০১৯: ৪৬)। উত্তরবঙ্গে সম্পন্ন হওয়া এ চলচ্চিত্রের শ্যুটিং সংশ্লিষ্ট নানা কাজ আর পরিবহনের ভাড়াতেই ব্যয় হয় সেই অর্থ। চলচ্চিত্রে অংশগ্রহণকারী কুশীলবরাও স্বআগ্রহে অংশ নেয় – তাঁদের তেমন কোনো পারিশ্রমিক দিতে হয়নি (হোসেন, ২০১৯: ৭৮)।

উত্তরবঙ্গের নওগাঁর মহাদেবপুর গ্রামে ছিল শুটিং লোকেশন। সেখানে পুরো শুটিং ইউনিটের থাকার ব্যবস্থা হয়েছিল ইউনিয়ন পরিষদের কাউন্সিল ভবনে – একটা বেস ক্যাম্প-এর মাধ্যমে (বিপ্লব, ২০১৯: ৪৬)।[১৯] জানুয়ারি মাসের কনকনে শীতের মাঝে এখানে মাটির উপর খড় আর চাটাই বিছিয়ে তার উপর তোষক ফেলে ব্যবস্থা হয়েছিল কলাকুশলীদের থাকার। তবে চিত্রগ্রাহক আনোয়ার হোসেনকে আলাদা ঘর দেওয়া হয় তাঁর সস্ত্রীক অবস্থানের কারণে। নিজ নিজ লেপ বালিশ নিয়ে আসার অনুরোধ আগে থেকেই ছিল সকলের প্রতি। লোকেশনের বিস্তির্ণ মেঠো পথ আর কিছু দূরে দূরে থাকা মাটির ঘর-বাড়িগুলোতে বিদ্যুৎ সরবরাহ ছিল না। শুটিং-এর সময় ঢাকা থেকে নিয়ে যাওয়া জেনারেটের আলোও পর্যাপ্ত হচ্ছিল না। শেষে পল্লী বিদ্যুতের কর্মকর্তাদের সহায়তায় আলাদা ট্রান্সফরমার বসিয়ে আনা হয় বিদ্যুতের সংযোগ। ১৬ মিলিমিটার ১টি ক্যামেরা দিয়ে সম্পন্ন হয় শ্যুটিং, যেটা আবার চলেছে গাড়ির ব্যাটারি দিয়ে। নানা প্রতিকূলতার মাঝে সম্পন্ন হওয়া এই চলচ্চিত্র যখন ১৯৯৩ সালে ব্যক্তিগত উদ্যোগে বিভিন্ন দূতাবাস কিংবা ভাড়া করা মিলনায়তনগুলোতে প্রদর্শিত হয়, তখন চলচ্চিত্র বোদ্ধাগণ এ চলচ্চিত্রের বিষয়ে অনেকটাই নীরব ছিলেন। কোনো কোনো সমালোচক আবার চলচ্চিত্রটিকে কড়া ভাষায় নাকোচ করেন। এমনকি সাংবাদিক আজিজ মিছির এ চলচ্চিত্রের বিষয়ে "উল্লেখের অনুপযোগী মন্তব্য" করেন বলে জানা যায় (হোসেন-এ উদ্ধৃত, ২০১৯: ৮১)। তবে সে সময়ের বিশ্ববিদ্যালয় পড়ুয়া শিক্ষার্থী কিংবা তরুণ চলচ্চিত্রকর্মীদের মাঝে এই চলচ্চিত্র বিশেষ প্রভাব ফেলে। তারুণ্যের দীপ্ত প্রহরে *চাকা* দেখার অভিজ্ঞতা ও অভিঘাত প্রসঙ্গে এ সময়ের প্রখ্যাত বাংলাদেশি চলচ্চিত্র পরিচালক মোস্তফা সরয়ার ফারুকী বলেন:

> চাকা সিনেমাটি আমি দেখি ২৫ বছর আগে। এ ২৫ বছরে আমিও বড় হয়েছি আর ছবিটাও আমার ভেতরে গ্রো করেছে। [...] এই যে এত বছর পরেও, যেখানে বইয়ের পাতা মলিন হয়ে যায়, ৩৫ মিলিমিটারে ফাংগাস পড়ে যায়, ভিডিওতে স্ক্র্যাচ পড়ে যায়; সেখানে আমি পরিস্কার দেখতে পাচ্ছি আমার মাথার ভেতর প্রিন্টটা কীরকম ঝকঝকে আর জীবন্ত আছে এখনো। এটাই হচ্ছে বড় সিনেমার শক্তি (ফারুকী, ২০১৯: ৪২)।

---

১৯. উল্লেখ্য, প্রবন্ধের এই প্যারাগ্রাফে উদ্ধৃত অধিকাংশ তথ্যই গোলাম রাব্বানী বিপ্লবের উপরোক্ত লেখা থেকে সংগ্রহ করা হয়েছে: গোলাম রাব্বানী বিপ্লব। "চাকা আমাদের চলচ্চিত্র আন্দোলনের অন্যতম সফল ফসল"। (ঢাকা: চলচ্চিত্রম ফিল্ম সোসাইটি, ২০১৯)। পৃ. ৪৬–৫০।

মুক্তির সময়ে বাংলাদেশের সমালোচক মহলে উপেক্ষিত হলেও *চাকা* যেমন তরুণ প্রজন্মকে উদ্বুদ্ধ করে, তেমনি বিদেশি দর্শকদেরও মুগ্ধ করে এ চলচ্চিত্র। এর প্রমাণ মেলে আন্তর্জাতিক নানা গুরুত্বপূর্ণ উৎসবে চলচ্চিত্রটির পুরস্কার প্রাপ্তির মধ্য দিয়ে। ১৯৯৩ সালে জার্মানির ম্যানহাইম চলচ্চিত্র উৎসবে আন্তর্জাতিক সমালোচক পুরস্কার (FIPRESCI) ও ইন্টার ফিল্ম জুরি পুরস্কার অর্জন করে *চাকা*। ১৯৯৪ সালে এ চলচ্চিত্র প্রাপ্ত হয় ফ্রান্সের ডানকার্ক আন্তর্জাতিক চলচ্চিত্র উৎসবে শ্রেষ্ঠ চলচ্চিত্র, শ্রেষ্ঠ পরিচালক ও স্টুডেন্ট জুরির বিবেচনায় শ্রেষ্ঠ চলচ্চিত্রের পুরস্কার। এই একই বছর অর্থাৎ ১৯৯৪ সালে কান চলচ্চিত্র উৎসবে প্রতিযোগিতা পর্বের বাইরে গিয়ে এ চলচ্চিত্রের প্রদর্শন হয় এবং চলচ্চিত্র বোদ্ধাদের নজড় কাড়ে ছবিটি (মজুমদার, ২০১৯: ৩৪)। এ ছাড়াও ১৯৯৫ সালে *চাকা*র সৌভাগ্য হয় ফ্রান্সের মর্যাদাপূর্ণ জর্জেস ও রুতা সাদুল এ্যাওয়ার্ড অর্জনের। এ সকল স্বীকৃতির পাশাপাশি আন্তর্জাতিক বহু সমালোচক ও সাংবাদিক *চাকা*র প্রশংসায় কলম ধরেছেন (চিত্র ১০)। থাইল্যান্ডের প্রখ্যাত স্বাধীন চলচ্চিত্র নির্মাতা এপিচাটপঙ ভিরাসথাকুল, যিনি কান চলচ্চিত্র উৎসবে জুরি এওয়ার্ড ও পাম দি অর পেয়েছেন, তিনি *চাকা*কে তালিকাভুক্ত করেছেন তাঁর প্রিয় ৫০টি বিশ্বচলচ্চিত্রের তালিকায়।[২০] অতএব *চাকা*কে নিয়ে এর স্বপক্ষে কিংবা বিপক্ষের বিতর্ক এড়িয়ে এই চলচ্চিত্রের বিশেষ বিশ্লেষণ প্রয়োজন চলচ্চিত্রটির শিল্পভঙ্গি অন্বেষণের লক্ষ্যে। আর এক্ষেত্রে এর কাহিনির সূত্র ধারণকারী মাধ্যমটির সাথে এর তুলনামূলক আলোচনার পরিবর্তে একে স্বতন্ত্র শিল্প হিসেবে বিবেচনা করে এর চলচ্চিত্রিক ভাষা, ভঙ্গি ও ডিটেইলস্ অনুসন্ধানই মূল লক্ষ্য হওয়া উচিত।

চিত্র ১০. বিদেশি বিভিন্ন পত্রিকায় *চাকা* চলচ্চিত্রের বিভিন্ন প্রদর্শনীর খবর ও শিল্প সমালোচনামূলক প্রকাশিত নিবন্ধের কোলাজ (কোলাজ নির্মাণ করেছেন প্রবন্ধ রচয়িতা, তবে পত্রিকাসমূহ সংগৃহীত হয়েছে পরিচালক মোরশেদুল ইসলামের কাছ থেকে)।

২০. https://www.imdb.com/list/ls022839063/ (লিংকে প্রবেশের তারিখ: ২ জুন, ২০২৩)।

চাকা চলচ্চিত্রের গল্প মোটামুটি সরল, যেখানে নাটকের মূল কাহিনির চলন সুরক্ষিত হয়েছে। ফসল কাটার মওসুমের কোনো এক ভোরে দুই গাড়োয়ন (একজন প্রবীণ, আর একজন অপেক্ষাকৃত তরুণ) গরুর গাড়ি নিয়ে রওয়ানা হয়েছে এক গাঁ থেকে ধান তুলে অন্য গাঁয়ে পৌঁছে দেবার উদ্দেশে। পথে হাসপাতালের ডাক্তারের অনুরোধ, ভয় প্রদর্শন ও সামান্য অর্থ প্রাপ্তির সূত্রে বদলায় তাদের গাড়ির গতিপথ। ডাক্তারের কথা মতো তারা রওয়ানা হয় গত রাতে শহর থেকে আসা অপঘাতে মৃত একটি লাশ নিয়ে তার ঠিকানায় পৌঁছে দেবার লক্ষ্যে। প্রায় দুই দিন ও এক রাত তারা গাঁয়ের মেঠো পথ ধরে চলে লাশটিসহ গরুর গাড়িতে। বিস্তির্ণ প্রান্তরকে প্রেক্ষাপটে রেখে গরুর গাড়ির ধীর লয়ের চলন আর সেই চলন সৃষ্ট ক্যাঁচ ক্যাঁচ এক ঘেয়ে শব্দ হয়ে দাঁড়ায় চলচ্চিত্রের প্রধান দৃশ্যকল্প। এক গ্রাম থেকে তাদের বলা হয় অন্যগ্রামে যেতে। নবগ্রাম, নবিগ্রাম ও শিবগঞ্জ – এই তিন গাঁয়ের কোনো গাঁয়েই তারা পায় না লাশের ঠিকানা। লাশটিকে ফেলেও তারা পালিয়ে যায় না। কিংবা ফিরে যায় না এর প্রাপ্তির মূল ঠিকানা – সেই হাসপাতালে। এক মানবিক দায়বদ্ধতার দায়ভার লাশটির চেয়েও অধিক ওজন নিয়ে ওদের কাঁধে চেপে বসে। এদিকে লাশটি ফুলে ওঠে – পঁচনের গন্ধ ছড়ায়। এরপর প্রবীণ গাড়োয়ান প্রথমে পথের বাঁকে গল্পরত কিছু গ্রামবাসীর নিকট তাদের গ্রামে লাশটি দাফনের অনুরোধ করে। সেখান থেকেও প্রত্যাখাত হয়ে সে সাহায্য চায় মসজিদের ইমামের কাছে লাশটিকে কবরস্থ করার বিষয়ে। ইমামও অস্বীকৃতি জানায় এই লাশের দাফনে। তার মতে লাশটির ধর্ম পরিচয় না জেনে এর দাফন করা না জায়েজ কাজ তার পক্ষে। লাশটি বিধর্মীর হলে আল্লাহ তার প্রতি নারাজ হবে। শেষ পর্যন্ত, এই লাশটিকে একটি নদীর চরে ঐ দুই গাড়োয়ান হাতে দিয়ে মাটি তুলে কবর খুড়ে কবরস্থ করে। পড়ন্ত গোধূলির ম্রিয়মাণ কমলা আলোয়, এ লাশ দাফনের পর নদী তীরে বসা অসহায় দুই গাড়োয়ানের অশ্রুজলের মাঝে ফুটে ওঠে যে বেদনা – তা যেন স্বজন হারানোর কষ্টের চেয়ে কোনো অংশে কম নয়।

চাকা চলচ্চিত্রে জীবন চক্রের 'চলমানতা'র বিষয়টি গুরুত্ব পেয়েছে। তবে এ চলমানতা ধীর লয়ের। নৃতাত্ত্বিকের মনোভঙ্গিতে বাংলাদেশের উত্তরবঙ্গের জীবনযাত্রার মন্থর গতিকেই যেন চাকার প্রবাহে তুলে আনলেন পরিচালক। চলচ্চিত্রের শুরুতেই কুশলীলিপির অংশ থেকেই শ্রুত হয় উত্তরবঙ্গের লোকজ সুরের বাদন। বেহালা, একতারা, আর বাঁশির মিলিত সুরে ভাওয়াইয়া গানের যে সুর ভেসে ওঠে এই অংশে, তাতে উঁচুনিচু মেঠো পথে গরুর গাড়ির চলনের ছন্দটি যেন অনূদিত হয়। তবে চাকার চলনের ইঙ্গিতবাহী এ সুরের মাঝে ফাঁকে ফাঁকে বাঁশির বাদনে এক বিষণ্নতার রেশ সৃষ্টি হয়। এ চলচ্চিত্রের আবহ সংগীত সৃষ্টিতে ছিলেন পুলক গুপ্ত।[২১] সূচনা সংগীতের এই অংশে তিনি মূলত গুরুত্ব দিয়েছেন তিনটি বিষয়ের প্রতিঃ প্রচলিত ভাওয়াইয়া সুরের সৃষ্টিশীল প্রয়োগ, চাকার ক্রমাগত চলনকে সংগীতে প্রযুক্ত তালের ভেতর দিয়ে ধরা, আর লাশ বহনকারী গাড়িটির চলন সৃষ্ট এক শোকাবহ আবহ সৃষ্টি (গুপ্ত, ২০২৩)। অবশ্য দর্শক তখনও জানে না যে, এই চলচ্চিত্রের মূল বিষয়বস্তুই হলো একটি লাশকে তাঁর ঠিকানায় পৌঁছে দেবার লক্ষ্যে দুই গাড়োয়ানের গরুর গাড়িতে করে পরিভ্রমণ। তবে চলচ্চিত্রটির বিষয় ও ভাব নিয়ে এক প্রাক-প্রস্তুতি যেন তৈরি হয় দর্শকের মাঝে এই সূচনা সময়ের আবহ সংগীত শ্রবণে। আবহ সংগীতের বিপরীতে গরুর গাড়ি চলা মেঠো পথের রাঙা রঙটি যেন উঠে আসে গ্রাফিক্সে – দৃশ্যমান লেখার কমলা বর্ণে। ফ্রেমময় বিস্তৃত কালো রঙের

২১. পুলক গুপ্ত বর্তমানে সাংবাদিকতা পেশায় আছেন – কাজ করেন লন্ডনস্থ বি.বি.সি. বাংলায়। পেশাদার সংগীত পরিচালক না হয়েও চলচ্চিত্র সংসদ আন্দোলন ও শর্ট ফিল্ম ফোরামের সাথে কাজের সম্পৃক্ততার কারণে তাঁকে আমরা দেখি বিকল্প ধারার কিছু চলচ্চিত্রে সংগীত পরিচালকের ভূমিকায় কাজ করতে। তা সত্ত্বেও তাঁর কাজে আছে সুরের নন্দনিক প্রয়োগ ও পেশাদারিত্ব।

প্রেক্ষাপটে কমলা বর্ণের অক্ষরমালার বিপরীতে ভাওয়াইয়া সুরের যে দোলায়িত করুণ রসের আবহ, তা যেন সমগ্র চলচ্চিত্রের মূল সুরটিকেই ইঙ্গিত করে।

কলাকুশলী লিপি (Credit line)-এর দৃশ্যায়নের পর সূচনা হয় চলচ্চিত্রের। বাঁশ পাতার ফাঁকে উঁকি দেয় কুয়াশা ঘেরা বিস্তৃত প্রান্তর। এই একই শটে ক্যামেরা প্যান করে ধরে উদয়মুখা সূর্যের হালকা কমলা আলো। রাত্রির অন্ধকারের রেশ তখনও সম্পূর্ণরূপে পরাস্ত হয়নি। কুয়াশার ঘোর লাগা আমেজের ভেতর দিয়ে ফুটে উঠে সদ্য পাকা ফসল কাটা বিস্তৃত ধানের ক্ষেত। পাখপাখালির কিচির মিচির শব্দের ভেতর একটি ছইওয়ালা গরুর গাড়ি চলে যায় ক্যাঁচ ক্যাঁচ ধ্বনি তুলে। তারপর ধান ক্ষেত থেকে প্যান করে ক্যামেরা স্থির হয় একটি মেঠো পথের দৃশ্য ধারণে। দেখা যায়, কুয়াশা ভেদ করে একটি ছইবিহীন গরুর গাড়ির দোলায়িত আগমন – দুপাশে গাছের সারি। সূর্যের কমলা আলো আরও একটু গাঢ় হয়েছে। পাখপাখালির শব্দ আর গরুর গাড়ির ক্যাঁচ ক্যাঁচ শব্দ মিলে মিশে ভোর বেলার যাত্রা সময়ের একটি শুভ মুহূর্তের ইঙ্গিত দেয়। লঙ শট থেকে মিড শট এবং মিড থেকে ক্লোজ শটে দৃশ্য উন্মোচিত হতে থাকে। আমরা দেখি সেই গরুর গাড়িতে দুই গাড়োয়ান বসা। একজন অপেক্ষাকৃত প্রবীণ যিনি ধরে আছেন গরুর গাড়ির জোয়াল। অন্যজন অপেক্ষাকৃত তরুণ – প্রবীণের পেছনে। সে প্রবীণের সহকারী অর্থাৎ পইরাত। গাড়ির চলমানতায় তারা নিজেদের মাঝে বিড়ি বিনিময় করে। গাড়ি চলছে – কখনো ক্যামেরাকে পেছনে ফেলে। কখনও ফ্রেমের ডান থকে বাঁয়ে এবং বাম থেকে ডানে চলছে গাড়ি। গাড়ির শট থেকে ধীরে ধীরে চাকার শটের ক্লোজ আপে দেখি – এর ঘূর্ণন আর চলমানতা। এক পর্যায়ে গান ধরে নবীন গাড়োয়ান:

ও রাঙা, ধলা রে,
মন গোমরা করিস না রে
চল মিঠাখালিতে,
ফিরা আইসা সরিষার খৈল
ভরা পাবি চারিতে।

মন কেনো তোর গোমড়া রে রাঙা
সে কথা মুই জানি,
জনম গেলো আরজ আলী
ব্যাপারীর ক্ষ্যাপ টানি।
মন কেনো তোর গোমড়া রে ধলা
সে কথা মুই জানি,
জনম গেলো আরজ আলী
ব্যাপারীর ক্ষ্যাপ টানি।
চলবে চান ব্যাপারির ব্যাপার যদ্দিন তুই না থে,
মন গোমরা করিস না রে
চল মিঠাখালিতে।

জিওল গাছে আগের মতো নেই কেনো ভাই কস,
কোথায় গেলো আমার ন'ভাইর রসিয়া মনের রস,
যেমন রস নাই ইস্পিলার মেসিঙের খৈলেতে,
মন গোমরা করিস না রে
চল মিঠাখালিতে।

খৈল বিচালি তদ্দিন পাবি চাকা যদ্দিন ঘুরাবি,
প্রাণ পঙ্খি তোর দেহ ছাড়লে ভাগাড়ে যাবি,
তর সইব না তোরে ফেলতে ন'ভাইর অদের খালেতে (ইসলাম, ১৯৯৩)।

গানটি এমন ভাবে গাওয়া হয় যেন মনে হয় নবীন গাড়োয়ান তাঁর নিজ কণ্ঠে গাইছে গানটি। কিন্তু প্রকৃত অর্থে গানটি স্টুডিওতে ধারণ করে সম্পাদনার সময় সংযুক্ত ও সমন্বয় করা হয়েছে অভিনেতার ঠোঁটে। কুশলী লিপি থেকে জানা যায়, এর কণ্ঠশিল্পী ছিলেন বাংলাদেশের ভাওয়াইয়া গানের প্রখ্যাত শিল্পী রথীন্দ্রনাথ রায়। গানটি লিখেছেন আকরাম খান, যিনি একাধারে এই চলচ্চিত্রের প্রধান সহকারী পরিচালকও ছিলেন। এই গানে কোনো যন্ত্রসংগীত প্রযুক্ত হয়নি। খালি গলায় গাওয়া এই গান চলচ্চিত্রের মাঝে সত্যিকার ভাবে উৎস নির্গত (Diegetic) সংগীতের প্রণোদনা সৃষ্টি করে। আর যে কারণে চলচ্চিত্রিক বাস্তবতা সৃষ্টিতে অত্যন্ত সফলভাবে সহায়ক হয়েছে গানটি। এই গানের কথামালার ভেতর দিয়ে আমরা সহজেই বুঝতে পারি শ্রমজীবী মানুষের মতো এই গরুদুটোর জীবনবৃত্ত – যতদিন শ্রম দিতে পারবে, ততদিন তাদের আদর যত্ন আছে। এরা যে এই গাড়োয়নদ্বয়ের মতো ভাড়া খাটে, সেই বিষয়টিও ফুঁটে ওঠে গানের কথায়। চলচ্চিত্রের শেষেও এই গানের অংশ বিশেষ আবার শ্রুত হয়, যদিও তা উৎস নির্দেশকারী সংগীত হিসেবে তখন আর আসে না। লাশটিকে কবরস্থ করার পর দুই গাড়োয়ান যখন স্বজন হারানোর বেদনায় বিষণ্ন মনে নদীর পারে বসে অশ্রুজল ফেলে, তখন প্রলম্বিত লয়ে এই গানের শেষ অংশটি দর্শকের হৃদয় তন্ত্রীতেও তোলে ক্রন্দনের সুর। আর তা প্রযুক্ত হয় উৎস নির্দেশহীন (Non-Diegetic) সংগীত হিসেবে। অর্থাৎ প্রচলিত চলচ্চিত্রের মতো উৎস নির্দেশ না করেই এই সংগীত বেজে উঠে দৃশ্যের ভাবকে আরও ঘনীভূত করার উদ্দেশ্যে। এই চলচ্চিত্রের অধিকাংশ অংশেই ambience sound অর্থাৎ পরিবেশ সৃষ্ট শব্দের প্রতীতি জন্যে এমন শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে। পাখির কিচির মিচির, বিয়ে বাড়িতে মাইকে বাজানো গান, গাঁয়ের বাজারে রেডিও বা ক্যাসেট প্লেয়ারে চলা গান, সিনেমার প্রচারে পোস্টার নিয়ে পরিভ্রমণের সময় ঢাক-ঢোলের বাদন, রাতে ঝিঁঝি পোকার ডাক, সাধারণ লোকজনের কথাবার্তা, গরুর গাড়ির চলনের ক্যাঁচ ক্যাঁচ শব্দ ইত্যাদি। তবে কোথাও কোথাও দৃশ্য অন্তর্গত করুণ রসকে আরও আবেগায়িত করার জন্য নবীন গাড়োয়ানের গাওয়া গানটির সুর বেজেছে ধীর লয়ে। এই আবহ সংগীতে প্রযুক্ত এই সব সুরময় অংশ অতটা বেমানান লাগে না যেহেতু মূল গানের সুরেরই বিভিন্ন ধর্মী চলন রক্ষিত হয়েছে এ সকল অংশে। তবে মসজিদের হুজুরের কাছ থেকে প্রত্যাখ্যানের পরবর্তী অংশে যেভাবে তীব্রভাবে বেদনা সৃষ্টিকারী সংগীতের প্রয়োগ ঘটেছে– তা যেমন আরোপিত মনে হয়েছে এবং একই সাথে কানেও লেগেছে কিছুট উৎকটভাবে। প্রচলিত বাণিজ্যিক ছবির আবহ সংগীতের উচ্চকিত ও মেলোড্রামাটিক প্রবণতা যেন এখানে প্রকটিত হয়।

চাকা চলচ্চিত্রের প্রধান সম্পদ এর ফটোগ্রাফি ও দৃশ্যনির্মাণ গুণ। এ চলচ্চিত্রের দৃশ্যগ্রহণে ছিলেন বিখ্যাত চিত্রগ্রাহক আনোয়ার হোসেন। এ চলচ্চিত্রে গরুর গাড়ির চাকার চলমানতার ফাঁকে ফাঁকে গ্রামীণ নিসর্গের চলমানতাও উঠে এসেছে অত্যন্ত হৃদয়গ্রাহী ভঙ্গিতে। তবে এই চলমানতায় বাস্তবতা খণ্ডিত হয়েছে কোথাও কোথাও। কোনো একটি শটে গরুর গাড়িটি হয়ত ফেমের বাঁ পাশ থেকে ডান পাশে গেলো – আবার পরবর্তী শটেই দেখা গেলো যে, গাড়িটি ফ্রেমের ডান পাশ থেকে বাঁ পাশে যাচ্ছে। এতে মনে হয়ঃ গাড়িটি যে পথে যাচ্ছিল, যেন মুহূর্তেই সে তার গতিপথ বদলে উল্টোপথে যাচ্ছে। অর্থাৎ চিত্র ধারণের সময় ১৮০ ডিগ্রি অবস্থানের ভেতর ক্যামেরাকে রেখে বস্তু/বিষয়কে ধারণের মাধ্যমে যে বাস্তবতা রক্ষা করা হয়, তা লজ্ঘিত হয়েছে উপরে বর্ণিত শটের মতো শটগুলোতে। সম্পাদনার সময় ঐ দুটো শটের মধ্যবর্তী শটে গাড়োয়ানদের সম্মুখবর্তী শট বা অন্য একটি শট বসিয়ে এই ত্রুটি দূর করা যেতো। কিংবা পরিচালক হয়ত চাকার ক্রমাগত চলনের মাঝে ইচ্ছাকৃতভাবেই ধাক্কা সৃষ্টির জন্য দৃশ্য/ফ্রেম ধারণের ব্যাকরণকে ভেঙ্গেছেন। তবে এই ধাক্কা যে ইচ্ছাকৃত নয় – তা মনে হয় যখন দেখি, চলচ্চিত্রটির মাঝে দীর্ঘ সময়ব্যাপী বিভিন্ন লঙ শটের অবস্থান ও প্রাধান্য। আর শটে সৃষ্ট এই মন্থরতা চলচ্চিত্রটির চাকার ধীর লয়ের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ।

এ চলচ্চিত্রের সংলাপ খুব কম। বিভিন্ন এ্যকশন আর কাজের ভেতর দিয়ে প্রকাশিত হয়েছে চরিত্রসমূহ বা ঘটনার অগ্রগতি। কোথাও কোথাও সংলাপের এই পরিমিতি কিংবা নীরবতা চাকার

গতির মন্থরতার মাঝে সমলয়ের যোগান দেয়। যেমন লাশটি হাসপাতাল থেকে নিয়ে যখন দুই গাড়োয়ান নবগ্রামের উদ্দেশে রওয়ানা হয়, তখন যাত্রার দীর্ঘ পথে তাদের ভেতর কোনো কথা হয় না। চলার এক পর্যায়ে গাড়ি থামিয়ে তারা একটি পুকুর পাড়ে গাছের নীচে বসে মুড়িও খায়। পুকুর থেকে পানি খায়। তারপর দীর্ঘ পথ চলা শেষে একটি বাজারে এসে থামে। তাদের বাজারে প্রবেশের পূর্বে পরিচালক বাজারের পরিবেশ সৃষ্টি করেন সংলাপ বিহীন দৃশ্য ও শব্দে। একটি দোকানে রেডিওতে সিনেমার গান বাজছে। কিছু লোক দোকানের সামনে বসে আছে। ভিন্ন ভিন্ন দোকানে দোকানীরা ব্যস্ত নানা কাজে। এক দল কিশোর দোকানের সামনের ফাঁকা জায়গায় খেলছে। তখনও আমরা কারো কোনো কথা শুনি না। বিভিন্ন এ্যকশনের মাধ্যমে দৃশ্যে হাজির হয় গ্রামের সাধারণ মানুষ ক্লোজ শট, মিড শট ও লঙ শটে। এমন সময় গাড়োয়নদ্বয় তাদের গরুর গাড়ি নিয়ে প্রবেশ করে বাজারে। তারা যখন জানায় যে, একটি লাশ নিয়ে এসেছে তারা। তখন আচম্বিতে শোনা যায় সবার কথা। কোলাহলের মাঝে দু একজনের কথা শোনা যায় উৎকণ্ঠার সাথে। এরপর একটি শিশু দৌড়ে চলে যায় বাজার থেকে, কণ্ঠে থাকে তার 'লাশ, লাশ' ধ্বনি। এরপর তাকে আর দেখা যায় না, তবে তার এই শব্দ সমষ্টির আওয়াজ সংক্রেমিত হয় আরও নানা কণ্ঠে, যার বিপরীতে আমরা দেখি গাঁয়ের নানা পরিস্থিতি। যেমন একজন মধ্যবয়সী নারী পুকুর পাড়ে কাপড় ধুচ্ছিলেন। তিনি থেমে যান এই 'লাশ লাশ' চিৎকারে। এর পর একজন হিন্দু নারী তুলসী তলায় পূজা দিচ্ছিলেন, তিনিও থমকে যান দূর থেকে ভেসে আসা এই লাশ আসার সংবাদে। তার মনে শংকা জাগে তার শহরে পড়াশোনা করা সন্তানকে নিয়ে। আবহ ভাষ্যে শোনা যায় তার সন্তানের কণ্ঠ। অর্থাৎ কল্পনায় ছেলের সাথে তার পূর্বের কথোপকথন ভেসে উঠছে। এরপর দেখি, এক যুবতী মাটির ঘরের ভেতর আয়নায় মুখ রেখে প্রসাধন করছে, কণ্ঠে তার গুন গুন করা গান। সেও শুনতে পায় দূর থেকে ভেসে 'লাশ লাশ' শব্দ। ঘর থেকে বেরিয়ে এসে উৎকণ্ঠার সাথে ব্লাউজের নীচ থেকে সে বের করে আনে তার প্রেমিকের চিঠি। কিছুক্ষণ সেই চিঠি পড়ে সে। তারপর অজানা ভয়ের অনুভূতি প্রকাশ পায় তার অভিব্যক্তিতে। এ ভাবে খুব অল্প সংলাপের প্রয়োগে এগিয়েছে এই চলচ্চিত্র। তবে সংলাপ অল্প হলেও নানা মানুষ এসেছে তাদের জীবনের বিভিন্ন অনুষঙ্গ নিয়ে। নবগ্রাম, নবীগ্রাম বা শিবগঞ্জ – এই তিনটি গ্রামেই আমরা দেখি অসংখ্য মানুষ। কোনো কোনো মানুষের বিশেষ পরিজনদের কথাও এসেছে খুব অল্প সংলাপে। তবে দুই গাড়োয়ানের জীবনের কোনো প্রসঙ্গ অর্থাৎ তাদের পরিবার-পরিজন বিষয়ে আমরা কোনো ইঙ্গিত পাই না। লাশ নিয়ে এই অপ্রত্যাশিত যাত্রায় যে দীর্ঘসূত্রিতার সৃষ্টি হয় এবং তার ফলে পরিবার বিচ্ছিন্ন হয় তারা। এবং এ নিয়ে তাদের নিজ পরিবারের পরিজনরা কী ভাবছে – সে প্রসঙ্গের অনুল্লেখ ঘটনার বাস্তবতাকে সম্পূর্ণতা দানে কিছুটা হলেও বাধার সৃষ্টি করে। আর এখানেই কাহিনিটিকে এক রৈখিক মনে হয়।

তবে সংলাপ অল্প হলেও ডিটেইল অর্থাৎ বিভিন্ন পরিস্থিতির নানা অনুষঙ্গ উঠে এসেছে এই চলচ্চিত্রে অত্যন্ত শিল্পিত ভঙ্গিতে। যেমন হাসাপাতালের দৃশ্যে আমরা রোগীদের কোনো সংলাপ শুনি না। কেবল দেখি, গ্রামের হাসাপাতালের পরিবেশ সৃষ্টিকারী রোগীদের নানা পরিস্থিতি। একজন বৃদ্ধাকে বাঁশের মধ্যে আসন লাগিয়ে বহন করে আনছে গাঁয়ের দুজন লোক। এক সারিতে দাঁড়িয়ে আছে রোগীরা, যেখানে গ্রামীণ নারীদেরই সংখ্যা অধিক। কারো কোলে বাচ্চা কাঁদছে। দু-একজন মাঝবয়সী পুরুষ সারি থেকে বেরিয়ে এসে বসে আছে এলোমেলো ভাবে। একজন বৃদ্ধা বয়সের ভারে কুঞ্চনওয়ালা গালে হাত দিয়ে চারপাশ দেখছে বিস্ময়ের চোখে, গায়ে তার হাওয়াই মিঠাই রঙের চাদর। এর মাঝে দেখা যায় একটি লাশ চাটাইয়ে মোড়ানো অবস্থায় পড়ে আছে হাসপাতালের উঠোনে, সবুজ ঘাসে। ডাক্তার হাসপাতালের দরজায় দাঁড়িয়ে উৎকণ্ঠা নিয়ে খুঁজতে চেষ্টা করছে একটি গাড়ি, তার পেছনে ঝুলছে হাসপাতালের সাদা পর্দা, যাতে লাল রঙে লেখা আছে 'পরিবার পরিকল্পনা'। সবমিলিয়ে হাসপাতালের দৃশ্যে পরিবেশের ডিটেইল নির্মাণের এই প্রবণতার মাঝে যেন প্রামাণ্যচিত্রের

দৃশ্যের প্রতীতি তৈরি হয়। অন্যান্য দৃশ্যগুলোতেও এই প্রবণতা বিদ্যমান। যেমন শিবগঞ্জের বিয়ে বাড়ি, নবগ্রামের বাজার, সন্ধ্যার আলোয় নবীগ্রামের পরিবেশ – ইত্যাদি নানান দৃশ্যে পেশা নির্দেশকারী নানা উপাদানসহ সাধারণ মানুষের উপস্থিতি তথ্যচিত্রের স্বাভাবিক পরিবেশকেই আমাদের মনে করিয়ে দেয়।

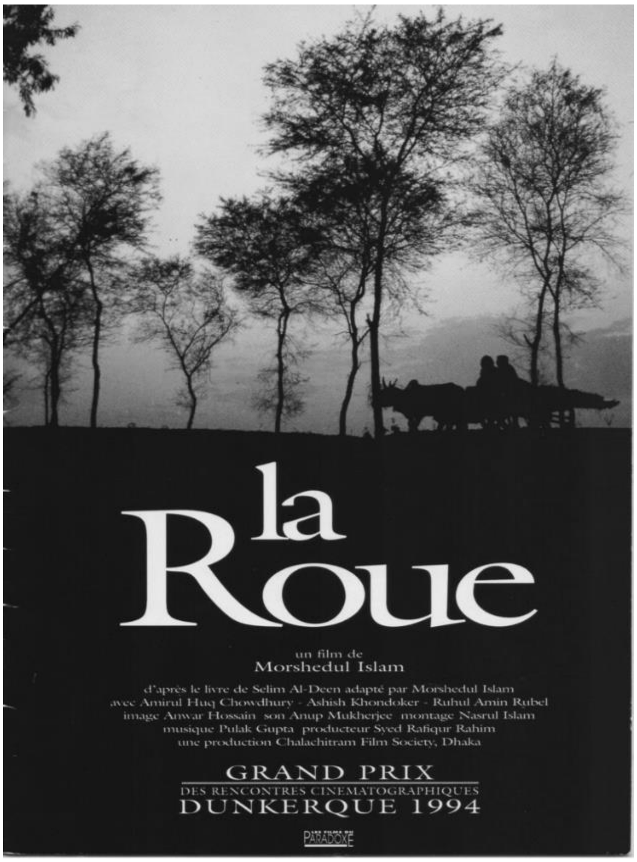

চিত্র ১১. বিদেশি চলচ্চিত্র উৎসবে প্রদর্শনের উদ্দেশে নির্মিত *চাকা* চলচ্চিত্রের একটি পোস্টার।
প্রাপ্তির উৎস: পরিচালক মোরশেদুল ইসলাম।

লাশটিকে বয়ে নিয়ে যাওয়ার পথে সময় গড়িয়ে গেলে এটি পচনোন্মুখ হয়ে উঠে। এই বিষয়টিও তুলে আনা হয়েছে বাস্তবসম্মত ভাবে। একটি শটে দেখায় যায়, লাশটির বেরিয়ে থাকা পায়ে অসংখ্য মাছি এসে বসেছে। পরিচালকের সাথে সাক্ষাৎকারের ভিত্তিতে জানা যায় যে, এই দৃশ্যটি ধারণের জন্য তিনি লাশে রূপদানকারী অভিনেতার পায়ে কাঠালের রস ও আঠা মাখিয়েছিলেন। যার কারণে মাছি এসে বসেছে তার পায়ে। যে ভাবেই তিনি এ দৃশ্য ধারণের জন্য উপায় খুঁজে বের করেছেন, তা জানার চাইতেও এই বিষয়টি জরুরি যে দৃশ্যটি মৃতের পচনমুখী প্রবণতার অভিঘাত সৃষ্টিতে যথেষ্ট বাস্তবধর্মী ছিল। এ ছাড়াও চলচ্চিত্রের শেষ পর্যায়ে একটি কুকুর তাদের অনুসরণ করে, তাও পরিবেশের ডিটেইল সৃষ্টিকারী একটি দৃশ্য, যার আয়োজন ততটা সহজসাধ্য নয়। তবে ডিটেইল নির্মাণের দিকে যথেষ্ট মনোযোগী এই চলচ্চিত্রের পরিচালক মোরশেদুল ইসলাম যে সব দৃশ্যে সমান ভাবে পরিবেশের

স্বাভাবিকতা সৃষ্টিতে সার্থক হয়েছেন তাও নয়। শেষদৃশ্যে নদীর পাড়ে নিজ হাত দিয়ে মাটি খুঁড়ে গাড়োয়ানদ্বয় যে কবর সৃষ্টি করে, তা বাস্তব সম্মত মনে হয়নি। একটি গরুর গাড়িতে দা জাতীয় বস্তু থাকাটা স্বাভাবিক, যে গাড়িটি রওয়ানা হয়েছিল মূলত ধান তুলতে। আর কবর খোঁড়ার সময় এ ধরনের কোনো ধারালো বস্তুর সহায়তা নিলে তা হতো বাস্তব সম্মত।

দৃশ্যগত বাস্তবতার সৃষ্টির পাশাপাশি *চাকা* চলচ্চিত্রটির মাঝে মনস্তাত্ত্বিক বাস্তবতার সৃষ্টিশীল নির্মাণের প্রয়াসও লক্ষণীয়। লাশের সাথে এই দুই গাড়োয়ানের যে আত্মিক সম্পর্কটি তৈরি হয় – তার একটি ক্রমিক উত্তরণ এতে আমরা দেখি। শুরুতে যে গাড়োয়ান এই লাশটি হাসপাতাল থেকে নিতেই অনাগ্রহ প্রকাশ করেছিল, সেই গাড়োয়ানই ধীরে ধীরে লাশটির একজন পরিজন হয়ে উঠে। সাধারণ গাঁয়ের মানুষদের এই লাশকে নিজ পরিজন হিসেবে গ্রহণের অনাগ্রহ তাকে যেন ক্রমেই প্রতিশ্রুতিবদ্ধ করেছিল একে দাফনের বিষয়ে। পরপর দুটি গ্রামে ঠিকানা খুঁজে না পেয়ে কিছুটা হতাশ বড় গাড়োয়ান রাতের আঁধারে দেখতে পায়, লাশটি উঠে এসে তার সাথে কথোপকথনে জড়ায়। মৃত এই লাশটিরও যেন খুব শীত লাগে কনকনে সেই শীতের রাতে। লাশটি কিছুটা স্নেহের উষ্ণতা খোঁজে এই নভাই অর্থাৎ বড় গাড়োয়ানের কাছে। একটা বিড়ি দেওয়ার মধ্য দিয়ে যেন সেই স্নেহ বিনিময় হয়। তারপর এই বিশাল পৃথিবীতে তার ঠিকানা খোঁজার চেষ্টা যে ব্যর্থ – তার একটা ইঙ্গিত দিয়ে মিলিয়ে যায় লাশটি। সত্যিকার ভাবে, লাশের মুখের এই কথাতো বড় গাড়োয়ানেরই চিন্তার এক বিবর্ধিতরূপ। চলচ্চিত্রের শেষ পর্যায়ে আমরা দেখি, সে তার সেই বিবর্ধিত চিন্তাকে বাস্তবতা দেয় লাশটিকে নিজেরা কবর খুঁড়ে কবরস্থ করার মধ্য দিয়ে।

চাকা মূলত মানবিক সম্পর্ককে মহৎ করে তুলে ধরার এক মানবিক চলচ্চিত্র। নামগোত্রহীন এক অজানা লাশের সাথে গাড়োয়ানদের এই সম্পর্কের যে নির্মিতি ও বিস্তার – তা লোকায়ত জীবন ও দর্শন উৎসারিত। যদিও অন্যান্য গাঁয়ের মানুষদের মাঝে আমরা সেই মানবিকতার উপস্থিতি সেভাবে দেখি না। ধর্মের মাঝেও দৃশ্যমান হয় না সেই মানবিকাতর ডাক। ধর্ম বা গোষ্ঠীর চেয়েও কোনো কোনো শ্রমক্লিষ্ট ব্যক্তিও যে মানবিকতার দিক থেকে মহান হয়ে উঠতে পারে – চাকার চলনে চলনে সেই সত্যটিই উঠে এসেছে এই চলচ্চিত্রে। *চাকা* তাই শুধুমাত্র একটি বেওয়ারিশ লাশকে দাফনের চলচ্চিত্র নয় – এ ছবির মধ্য দিয়ে মানবিকতা আর জীবন প্রবাহের জয়গানও গীত হয়, তবে এ গানের সুরটি করুণ।

সৈয়দ জামিল আমহেদ নির্দেশিত মঞ্চ নাটক *চাকা* (১৯৯১) ও মোরশেদুল ইসলাম পরিচালিত *চাকা* (১৯৯৩) চলচ্চিত্রের কিছু বৈশিষ্ট্যের তুলনামূলক উপস্থাপন

চাকা নাট্যপ্রযোজনা ও চলচ্চিত্রের কিছু বৈশিষ্ট্যের তুলনামূলক পর্যবেক্ষণ	
সৈয়দ জামিল আহমেদ নির্দেশিত *চাকা* নাট্যপ্রযোজনা	**মোরশেদুল ইসলাম পরিচালিত *চাকা* চলচ্চিত্র**
বর্ণনাত্মক নাট্যাভিনয় রীতি অনুসৃত মঞ্চ প্রযোজনা।	বিকল্প ধারার চলচ্চিত্র আন্দোলনের প্রেরণাজাত চলচ্চিত্র।
নির্মাণ কাল ১৯৯১ সাল।	নির্মাণ কাল ১৯৯৩ সাল।
সেলিম আল দীনের *চাকা* নাটকের কাহিনি, চরিত্র ও বর্ণনা অধিকাংশ ক্ষেত্রেই সুরক্ষিত হয়েছে।	সেলিম আল দীনের *চাকা* নাটকের মূল ভাবকে গ্রহণ করা হয়েছে। তবে এতে মূল নাটকের কাহিনির বিস্তৃতি, চরিত্র সংখ্যা, স্থান, বর্ণনা ইত্যাদি সুরক্ষিত হয়নি।

চাকা নাট্যপ্রযোজনা ও চলচ্চিত্রের কিছু বৈশিষ্ট্যের তুলনামূলক পর্যবেক্ষণ	
এখানে সম্পন্ন হয়েছে নাটকের বিষয় ও আঙ্গিকের সৃষ্টিশীল পুনর্নির্মাণ।	নাটকের বিষয়ের রূপান্তর ঘটেছে চলচ্চিত্রের আঙ্গিকে। নাটকের বর্ণনাত্মক আঙ্গিক অনুসরণের চেষ্টা সম্পূর্ণভাবে রহিত হয়েছে। চলচ্চিত্রের নিজস্ব ও সৃষ্টিশীল ভাষায় রূপান্তরিত নাট্যকাহিনি বর্ণনের চেষ্টা দৃশ্যমান।
অভিনয় বর্ণনাত্মক রীতিতে সম্পন্ন।	চরিত্রাভিনয় রীতিতে সম্পন্ন হয়েছে অভিনয়।
কথন, নৃত্যগীত ও বর্ণনামুখর অভিনয়। অভিনেতা-অভিনেত্রীদের কণ্ঠে সমবেত ও একক ভাবে প্রযুক্ত হয়েছে অসংখ্য গান।	স্বল্পকথননির্ভর অভিনয়ে স্বাভাবিকতা ও সূক্ষ্ম অভিব্যক্তির উপর গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। একজন অভিনেতার কণ্ঠে শুধু একটি গান প্রযুক্ত হয়েছে। এ গানের অংশ বিশেষ আবার নাটকের শেষে ব্যবহার করা হয়েছে আবহ সংগীত হিসেবে।
আবহ সংগীত তাৎক্ষণিকভাবে বাজানো হয়েছে, যাকে আমরা জীবন্ত সংগীত বলতে পারি।	ধারণকৃত আবহ সংগীত প্রযুক্ত হয়েছে Non-Digetic সংগীতের প্রেরণায়। অর্থাৎ এতে প্রযুক্ত আবহ সংগীতের উৎস নির্দেশ করা হয়নি।
গণঅভ্যুত্থানে নিহত শহীদদের প্রতি শ্রদ্ধার্ঘ্য নিবেদনের প্রেরণায় নির্মিত।	এখানে গণঅভ্যুত্থানের প্রসঙ্গে একেবারেই আসেনি।
নানান ধর্মের বিভিন্ন অনুষঙ্গ এসেছে লোকায়ত জীবনে নানা ধর্মের গুরুত্ব ও প্রভাব উপস্থাপনের উদ্দেশ্যে। নানা ধর্মের বিশ্বাস ও পৌরাণিক প্রসঙ্গ উপস্থাপনের মধ্য দিয়ে আবহমান গ্রাম বাংলায় নানা ধর্মের মানুষের সম্প্রীতি ও সহাবস্থানের বিষয়টিও উঠে এসেছে।	ধর্ম এখানে এসেছে সাম্প্রদায়িক মনোবৃত্তির প্রকাশে, নেতিবাচক অর্থে। আর ধর্মের এই রূপ উপস্থাপন কৌশলে পশ্চিমা দর্শকদের মনোযোগ আকর্ষণের প্রবণতা দুর্লক্ষ্য নয়।
প্রকৃত বাস্তবতা নয় বরং নাট্যিক বাস্তবতা নির্মিত হয়েছে প্রযোজনা রীতিতে। তবে এখানে বাস্তবতার নানা ব্যাখ্যা উপস্থাপিত হয়েছে সৃষ্টিশীল ভঙ্গিতে। যেমন লাশের প্রকৃত অবয়ব উপস্থাপিত হয়নি। ইঙ্গিতের ভেতর দিয়ে লাশের প্রকৃত অবয়ব নির্মিত হয় দর্শকের কল্পনায়।	বাস্তবতার প্রতীতি নির্মাণের প্রচেষ্টা দৃশ্যমান। লাশটির প্রকৃত রূপ নির্মিত হয়েছে একজন অভিনেতার মধ্য দিয়ে। লাশটির পচন প্রদর্শনের জন্য তার পায়ে কাঁঠালের আঠা মাখিয়ে সেই পা ঘিরে অসংখ্য মাছি প্রদক্ষিণের দৃশ্য ধারণ করা হয়েছে।
সময়ের ধারাবাহিকতা খণ্ডিত হয়েছে কাহিনির বিচিত্রমুখী অনুষঙ্গ সংযোজনের ভেতর। মুহূর্তের ভেতর স্থান, কালের নিজ সীমা ভেঙ্গে উপস্থিত করা হয়েছে ভিন্ন কাল কিংবা স্থান। এ প্রক্রিয়ায় দর্শকের কল্পনার প্রতি আস্থাশীলতা দৃশ্যমান।	সময়ের গতি একরৈখিক ও ধারাবাহিক ভাবে উপস্থাপিত হয়েছে।

চাকা নাট্যপ্রযোজনা ও চলচ্চিত্রের কিছু বৈশিষ্ট্যের তুলনামূলক পর্যবেক্ষণ	
ষাঁড়দ্বয় অভিনেতা-অভিনেত্রীর মাধ্যমে অভিনীত হয়েছে বর্ণনাত্মক অভিনয়রীতির শক্তিকে কাজে লাগিয়ে।	ষাঁড়দ্বয় ছিল সত্যিকারের ষাঁড় – জীবনের বাস্তবতা নির্মাণের অনুষঙ্গে।
অভিজ্ঞতা সম্পন্ন ও মহড়ার মাধ্যমে প্রশিক্ষিত নাট্যকর্মীরা অভিনয়ে অংশ নিয়েছেন।	কেন্দ্রীয় চরিত্রসমূহ ও দুই একটি চরিত্র ছাড়া অধিকাংশ সাধারণ মানুষের চরিত্রের রূপায়ণে অংশ নিয়েছেন গ্রামের সাধারণ মানুষ।
রূপসজ্জার ভেতর দিয়ে চরিত্রের বাস্তবতা সৃষ্টি করা হয়নি।	রূপসজ্জার মধ্য দিয়ে চরিত্রের বাস্তবতা সৃষ্টি করা হয়েছে অনেক চরিত্রের চরিত্রায়নে।
নানা বিন্যাস সৃষ্টির মধ্য দিয়ে নির্দেশকের ভূমিকাকে বড় করে দেখানোর প্রচেষ্টা দৃশ্যমান।	চিত্রদৃশ্যের ভাষা ও বিস্তৃতি (Detail), এবং অভিনয়ের স্বাভাবিকতা অধিক গুরুত্ব পেয়েছে।

উপসংহার

সকল শিল্পের লক্ষ্যই জীবনের নান্দনিক দিকের উপস্থাপন ও জীবনের প্রবহমানতায় প্রয়োজনীয় সার্বজনীন সত্যটির অনুসন্ধান ও উপস্থাপন। শিল্প সৃষ্টির প্রক্রিয়ায় বস্তুগত যে কোনো সত্যই শিল্পীর কল্পনা ও জীবনাভিজ্ঞতার আলোকে ভিন্নরূপ পরিগ্রহ করে। রবীন্দ্রনাথের কবিতার ভেতর শুনতে পাই কবির চেতনা ও কল্পনার রঙ কীভাবে বস্তুসত্যকে ভিন্নরূপে গড়ে তোলে: "আমারই চেতনার রঙে পান্না হলো সবুজ,/ চুনী উঠল রাঙা হয়ে।" সুতরাং শিল্প আত্মপ্রকাশেরও মাধ্যম। এ কারণেই একটি বিষয়ের উপর সৃষ্ট কবিতা বা চিত্রকর্ম ভিন্ন ভিন্ন স্রষ্টার সৃষ্টিতে লাভ করে স্বতন্ত্র রূপ। রূপান্তরের ক্ষেত্রেও এই বিষয়টি কাজ করে কমবেশি। অর্থাৎ মূল উৎস থেকে প্রাপ্ত বিষয় ভিন্ন রূপ প্রাপ্ত হয় নতুন রূপান্তরিত মাধ্যমে। আর নতুন রূপান্তরিত মাধ্যমে মূল মাধ্যমের স্রষ্টাকে হুবহু খুঁজতে যাওয়াটাও যথাযথ নয়। কেননা "each medium [...] possesses its own communicational energetics" (Gaudreault and Marion, 2004: 65)। এ কারণে দুই মাধ্যম – মঞ্চ ও চলচ্চিত্রে সেলিম আল দীন রচিত *চাকা* নাটকটির প্রয়োগে যে দুটি স্বতন্ত্র শিল্প গড়ে উঠেছে, তাদের শিল্পভঙ্গি অনুসন্ধানের এই প্রবন্ধে কিন্তু কোনটি ভালো, কোনটি অপেক্ষাকৃত কম ভালো – সে সিদ্ধান্ত যাচাইকে প্রাধান্য দেওয়া হয়নি। দুই মাধ্যমের স্বতন্ত্র ভঙ্গি, ভাষা ও উপাদানের ওপর ভিত্তি করে প্রযোজনা দুটির অভিঘাত ও নান্দনিক দিকের নানা প্রসঙ্গ অনুসন্ধান করা হয়েছে এই গবেষণা প্রবন্ধে। মাধ্যমগত স্বাতন্ত্র্যের কারণে দুই মাধ্যমে *চাকা* ভিন্নরূপ পরিগ্রহ করেছে। দুটোই অর্থাৎ *চাকা* (১৯৯১) নাট্য প্রযোজনা এবং *চাকা* (১৯৯৩) চলচ্চিত্র নিজ নিজ মাধ্যমের শিল্প ভাষার নান্দনিক নিরীক্ষার মধ্য দিয়ে স্বকীয় রূপ লাভ করেছে। তবে শিল্পভঙ্গির ভিন্নতা সত্ত্বেও শেষ পর্যন্ত, এই দুই শিল্প মাধ্যমেই মূল বিষয় হিসেবে মানবিক সম্পর্কের দিকটি মুখ্য হয়ে উঠেছে। একটি বেওয়ারিশ লাশের সাথে শ্রমক্লিষ্ট গাড়োয়ানদের যে আত্মিক সম্পর্ক রচিত হয় এবং তার ফলে ঠিকানা না পাওয়া এ লাশটিকে নিজেরাই কবর খননের মধ্য দিয়ে শেষশয্যা দান করে। আর এর ভেতর রচিত হয় মানবিকতার জয়গান। আর মানবিকতার এই জয়গান প্রতিধ্বনিত হয় উল্লিখিত দুটো শিল্প মাধ্যমের চাকার প্রবাহে, জীবনের গতির সমান্তরালে – এক কাঙ্ক্ষিত সার্বজনীন সত্য হয়ে।

কৃতজ্ঞতা প্রকাশ

এই গবেষণা প্রবন্ধ ২০২২-২৩ অর্থবছরে জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ের কলা ও মানবিকী অনুষদের অর্থায়ন প্রাপ্ত, আমার পরিচালনায় সম্পন্ন একটি গবেষণা প্রকল্প থেকে সৃষ্ট। এই আর্থিক সহায়তা গবেষণার কাজটিকে সহজসাধ্য করেছে অনেক ক্ষেত্রে। এ জন্য আমি সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের নিকট আমার কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি। প্রকল্পের সমাপ্তি শেষে, একে প্রবন্ধের আকার প্রদানের যাত্রাপথে, প্রবন্ধটির প্রাথমিক রূপ আমি পাঠ করেছিলাম একটি সেমিনারে। নাট্যাচার্য সেলিম আল দীনের ৭৪তম জন্মজয়ন্তী উপলক্ষ্যে, ১৮ আগস্ট ২০২৩ তারিখে, জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ের নাটক ও নাট্যতত্ত্ব বিভাগ আয়োজিত উক্ত সেমিনারে প্রবন্ধটি উপস্থাপনের সুযোগ, এর মানোন্নয়নে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখেছে। আমি কৃতজ্ঞচিত্তে নাটক ও নাট্যতত্ত্ব বিভাগ এবং ঐ সেমিনারে উপস্থিত সম্মানিত অতিথি ও আলোচকদের গঠনমূলক পরামর্শের জন্য তাঁদের আন্তরিক ধন্যবাদ জানাচ্ছি।

সহায়ক তথ্যপঞ্জি

(বাংলা গ্রন্থ ও প্রবন্ধের তালিকা)

আজম, মোহাম্মদ। (২০১৯)। "মোরশেদুল ইসলামের *চাকা*"। *মোরশেদুল ইসলামের চলচ্চিত্র: প্রসঙ্গ আগামী ও চাকা* হেমন্ত সাদীক (সম্পাদিত)। ঢাকা: চলচ্চিত্রম ফিল্ম সোসাইটি। পৃ. ৩৬ – ৩৯।

আহমদ, আফসার। (১৩৯৮ বঙ্গাব্দ)। "ঢাকা থিয়েটারের নতুন নাটক 'চাকা'"। *ত্রৈমাসিক সুন্দরম*: (পঞ্চম বর্ষ গ্রীষ্ম সংখ্যা): পৃ. ৯১-৯৪।

আহমদ, আফসার। (২০০৮)। "সেলিম আল দীনের শিল্পতত্ত্ব ও বিশ্ববীক্ষা"। *থিয়েটার স্টাডিজ*, নাটক ও নাট্যতত্ত্ব বিভাগ, জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়, (সেলিম আল দীন সংখ্যা), জুন: পৃ. ২৫–৩৮।

আহমেদ, সৈয়দ জামিল। (২০২২) "সেলিম আল দীন রচিত এক 'ধবল রক্তিমাভ নাট্যকথামালা': উত্তর-উপনিবেশবাদ, রাজনীতি এবং প্রজন্মান্তরে বাংলাদেশের নাট্যচর্চার রূপান্তর"। অভিজিৎ সেনগুপ্ত সম্পাদিত, *ফ্রন্টলাইন থিয়েটার*, পৃ. ১৩ – ৫৬।

আহমেদ, জামিল [নির্দেশিত]। (১৯৯১)। *চাকা*। ঢাকা: ঢাকা থিয়েটার [থিয়েটার প্রযোজনা]।

ইউসুফ, শিমূল। (২০২৩)। প্রকল্প পরিচালক কর্তৃক গৃহীত ভিডিও সাক্ষাৎকার। সাক্ষাৎকার গ্রহণের কাল জুন, ২০২৩।

ইসলাম, মোরশেদুল [পরিচালিত] [১৯৯৩]। *চাকা*। সৈয়দ রফিকুর রহিম প্রযোজিত: বাংলাদেশ। [চলচ্চিত্র]।

ইসলাম, মোরশেদুল [সাক্ষাৎকার]। (২০২১)। "সেলিম আল দীন-এর সৃষ্টির চলচ্চিত্রায়ন" শীর্ষক ওয়েবিনার থেকে উদ্ধৃত। নাটক ও নাট্যতত্ত্ব বিভাগ, জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক আয়োজিত, ওয়েবিনার আয়োজনের তারিখ: ১৮ আগস্ট, ২০২১। ওয়েবিনারের ইউটিউব লিংক: https://www.youtube.com/watch?v=y4Y3NodaRUk| (লিংকে অনুপ্রবেশের তারিখ: ১ জুন, ২০২৩)।

খান, মো. কামরুল হাসান। (২০২২)। *ভিন্ন চোখে সেলিম আল দীন, গ্রাম থিয়েটার ও নাটক বিষয়ক পাঁচমিশালি*। ঢাকা: হাওলাদার প্রকাশনী।

গুপ্ত, পুলক। ২০২৩। প্রবন্ধ রচয়িতার সাথে পুলক গুপ্তের কথপোকথনের মাধ্যমে গৃহীত তথ্য। মাধ্যম: ম্যাসেঞ্জার।

চৌধুরী, কবির। (২০১৯)। "মোরশেদুল ইসলামের 'চাকা' "। *মোরশেদুল ইসলামের চলচ্চিত্র: প্রসঙ্গ আগামী ও চাকা*। হেমন্ত সাদীক (সম্পাদিত)। ঢাকা: চলচ্চিত্রম ফিল্ম সোসাইটি। পৃ. ৬–১০।

ঠাকুর, রবীন্দ্রনাথ। (১৪০২ বঙ্গাব্দ)। "রঙ্গমঞ্চ", "বিচিত্র প্রবন্ধ"-এর অন্তর্ভূক্ত, *রবীন্দ্র-রচনাবলী* (তৃতীয় খণ্ড), কলিকাতা: বিশ্বভারতী। পৃ. ৬৭৯–৮০।

ঢাকা থিয়েটার। (১৯৯১)। *ঢাকা* নাট্যের প্রচারপত্রের প্রচ্ছদ পাতা।

দীন, সেলিম আল। [রচিত]। (১৯৯১)। *ঢাকা*। ঢাকা: গ্রন্থিক [কথানাট্য]।

দীন, সেলিম আল। (১৯৯৫)। "বাঙলা দ্বৈতাদ্বৈতবাদী শিল্পতত্ত্বে পূর্বাপর"। *থিয়েটার স্টাডিজ*, সংখ্যা ৩, নাটক ও নাট্যতত্ত্ব বিভাগ, জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়, জুন: পৃ. ৭–৪০।

দীন, সেলিম আল। (১৯৯৬)। *মধ্যযুগের বাঙলা নাট্য*। ঢাকা: বাংলা একাডেমী।

দীন, সেলিম আল। (সংগ্রহ, সঙ্কলন, রচনা ও সম্পাদনা)। (১৯৯৮)। *বাঙলা নাট্যকোষ*। ঢাকা: শিক্ষা ও সংস্কৃতি চর্চা কেন্দ্র, পৃ. ৫৪।

দীন, সেলিম আল। (২০০১)। "বাংলাদেশের নাটক: সঙ্কট ও সম্ভাবনা"। *থিয়েটার স্টাডিজ*, সংখ্যা ৮, নাটক ও নাট্যতত্ত্ব বিভাগ, জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়, জুন: ৭-১২।

ফারুকী, মোস্তফা সরয়ার ২০১৯। "*ঢাকা* আমাদেরকে নতুন ধরনের গল্প বলতে অনুপ্রাণিত করেছে।" *মোরশেদুল ইসলামের চলচ্চিত্র: প্রসঙ্গ আগামী ও ঢাকা*। হেমন্ত সাদীক (সম্পাদিত)। ঢাকা: চলচ্চিত্রম ফিল্ম সোসাইটি। পৃ. ৪০–৪৩।

বিডি নিউজ টোয়েন্টি ফোর। (২০১৩)। "নাটমণ্ডলে চাকা" শীর্ষক সংবাদ প্রতিবেদন। প্রতিবেদনটির অনলাইন লিংক: https://bangla.bdnews24.com/glitz/article662546.bdnews (লিংকে অনুপ্রবেশের তারিখ: ১ জনু, ২০২৩)

বিপ্লব, গোলাম রাব্বানী। (২০১৯)। "চাকা আমাদের চলচ্চিত্র আন্দোলনের অন্যতম সফল ফসল"। *মোরশেদুল ইসলামের চলচ্চিত্র: প্রসঙ্গ আগামী ও ঢাকা*। হেমন্ত সাদীক (সম্পাদিত)। ঢাকা: চলচ্চিত্রম ফিল্ম সোসাইটি। পৃ. ৪৬–৫০।

মজুমদার, পার্থ প্রতিম। (২০১৯)। "বাংলাদেশের গরুর গাড়িতে চেপে নাম-ঠিকানাবিহীন এক যুবকের লাশ প্যারিস শহরে এসে পৌঁছেছে।"*মোরশেদুল ইসলামের চলচ্চিত্র: প্রসঙ্গ আগামী ও ঢাকা*। হেমন্ত সাদীক (সম্পাদিত)। ঢাকা: চলচ্চিত্রম ফিল্ম সোসাইটি। পৃ. ৩১ – ৩৫।

রহমান, লুৎফর। (২০০৮)। "*ঢাকা* নাটক ও চিত্রনাট্য: একটি তুলনামূলক বিচার"। *থিয়েটার স্টাডিজ*, সংখ্যা ১৫, নাটক ও নাট্যতত্ত্ব বিভাগ, জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়, জুন: পৃ. ৩৯–৬০।

রায় সত্যজিৎ। (২০১৯)। *বিষয় ও চলচ্চিত্র*। (ঢাকা: কবি প্রকাশনী)।

রেজা, আহমেদ। (২০০০)। "চাকা: একটি ভাষাতত্ত্বিক বিচার"। *থিয়েটার স্টাডিজ*, সংখ্যা ৭, নাটক ও নাট্যতত্ত্ব বিভাগ, জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়, জুন: পৃ. ১০৭–১২৯।

সাদীক, হেমন্ত (সম্পাদিত)। (২০১৯)। *মোরশেদুল ইসলামের চলচ্চিত্র: প্রসঙ্গ আগামী ও ঢাকা*। ঢাকা: চলচ্চিত্রম ফিল্ম সোসাইটি।

সেন, অরুণ। (২০০০)। *সেলিম আল দীন: নাট্যকারের স্বদেশ ও সমগ্র*। বগুড়া: দুই বাংলার থিটোর প্রকশন।

হক, সৈয়দ। ১৯৯১। "গ্রন্থমুখ", *ঢাকা*, [সেলিম আল দীন রচিত], ঢাকা: গ্রন্থিক, পৃ. ৫।

হামিদ, ম. সম্পাদিত (২০০৫)। *বাংলাদেশ গ্রুপ থিয়েটার নির্দেশিকা*। বাংলাদেশ গ্রুপ থিয়েটার ফেডারেশান ও বেঙ্গল ফাউন্ডেশন এর যৌথ প্রকল্প নাট্য উন্নয়ন প্রকল্পের আওতায় মুদ্রিত। ঢাকা: বাংলাদেশ গ্রুপ থিয়েটার ফেডারেশান।

হাসান, অনুপম (২০১৯)। "সেলিম আল দীনের নব-নাট্যপ্রকরণে প্রান্তিক বাঙালির জীবনকথা"। *থিয়েটার*, ৪৮তম বর্ষ, ৩য় সংখ্যা, ডিসেম্বর। ১১৫-১৪৮।

হোসেন, আকরাম । (২০১৯)। "চাকার সাথে আমার স্মৃতি"। *মোরশেদুল ইসলামের চলচ্চিত্র: প্রসঙ্গ আগামী ও ঢাকা*। হেমন্ত সাদীক (সম্পাদিত)। ঢাকা: চলচ্চিত্রম ফিল্ম সোসাইটি। পৃ. ৭৭ – ৮২।

English References

Akhter, Fahmida. (2019). ‘*Agami* (*The Time Ahead*, 1984), the First “Short Film” of Bangladesh: Toward a New Cinematic Aesthetic of Imaging Time and Nation’. BioScope: 1–19.

Akhter, Fahmida. (2014). “Panning from the Past to the Present: The Climate, Context and Concept of Bangladeshi National Cinema”, *Shilpakala*, XXII: 49−67.

Balazs, Bela. (1953). *Theory of the Film*, Trans. Edith Bone. NY: Ray.

Gaudreault, André and Marion, Philippe. (2004). *Transécriture and narrative mediatics: The stakes of intermediality*. Trans. Robert Stam. In *A companion to literature and film*. Robert Stam and Alessandra Raengo (eds). Oxford: Blackwell. pp. 65.

Chow, Rey. (1995). *Primitive passions: visuality, sexuality, ethnography, and contemporary Chinese cinema*, New York: Columbia University Press.

পরিশিষ্ট: ১

ঢাকা থিয়েটার প্রযোজিত *চাকা* (১৯৯১) নাট্যপ্রযোজনার দলগত কর্মবণ্টন

কলাকুশলী

রচনা: সেলিম আল দীন

নির্দেশনা, মঞ্চ ও আলোক পরিকল্পনা: সৈয়দ জামিল আহমেদ

সুর ও আবহসংগীত পরিকল্পনা: শিমূল ইউসুফ

পোশাক পরিচ্ছদ ও দ্রব্যসম্ভার পরিকল্পনা: রাশেদুল হুদা

কোরিওগ্রাফ: মিনু হক

প্রচার ও প্রকাশনা: আফজাল হোসেন, রেজাউল হায়দার, সুলতান মুহম্মদ রাজ্জাক, মোসাদ্দেক মিল্লাত

মঞ্চ নির্মাণ, আলোক প্রক্ষেপণ ও নির্দেশনা সহকারী: আমিরুল ইসলাম টিপু

প্রযোজনা কর্মী: ইউসুফ খসরু, পলাশ, সাইফ উদ্দিন মাহমুদ, এহসান, মামুন, বকর, ফেরদৌস, জালাল, সুব্রত, মনু, মেজবাহ, শান্তনু, শাহরিয়ার।

ব্যবস্থাপনা: নাসির উদ্দীন ইউসুফ, সুবর্ণা মুস্তাফা, হুমায়ূন ফরিদী, হুমায়ূন কবীর হিমু

আলো সরবরাহ: সিরাজ আহমেদ

মিলনায়তন ব্যবস্থাপনা: ঢাকা থিয়েটার-এর কর্মীবৃন্দ

গ্রন্থিকগণ

শিমূল ইউসুফ: কথক, গরুর গাড়ির মিস্ত্রি, চাচি, গাড়িওয়ালা, লাশ

রাইসুল ইসলাম আসাদ: বাহের গাড়োয়ান

কৌশিক সাহা: প্রৌঢ়

দেলোয়ার হোসেন: শুকুরচান

সাইফুদ্দিন আহমেদ দুলাল: গ্রামের শ্রমিক, গাড়িওয়ালা, গ্রামের যুবক, বাজার শ্রমিক

নাসরিন নাহার: বউ, হাঁসুলী, কেঁচো

ফারুক আহমেদ: অর্শ রোগী ডাক্তার, হেডমাস্টার, দিনমজুর, সিনসাদুম

কামাল বায়োজীদ: শ্বেতী রোগী ডাক্তার, পাখি শিকারী, গ্রামের যুবক, প্যান্টপরা যুবক, কাছিম

মুস্তাগীসুর রহমান বাবু: ধরমরাজ

শহিদুজ্জামান সেলিম: গুদারার ভাড়া আদায়কারী, হোসেন আলী, বৃদ্ধ, বোয়াল

শতদল বড়ুয়া বিলু: গুদারার ভাড়া আদায়কারী, হোসেন আলী, বৃদ্ধ, বোয়াল

সহিদ হাসান রিঙ্কু: কুষ্ঠ রোগী, গাড়িওয়ালা, বিয়ে বাড়ির মালিক, গ্রামের যুবক, বাজার কমিটির মেম্বার

মিলু চৌধুরী: গুদারাঘাটের শ্রমিক, জব্বারের বাপ, শ্রমিক, কালো ষাঁড়ের মালিক, কাঁকড়া, বাজার শ্রমিক।

সাবেরী আলম: মেয়ে, মেয়ে সঙ্গী, রেহানা, হাঁস

শিল্পী সিদ্দিকা: মৌমাছি, শরবতি, হাঁস, মেয়েটি

রোজী সিদ্দিকী: বউ, রেহানা, হাঁস, মেয়ে সঙ্গী

কুমকুম হাসান: মেয়ে, হাঁসুলি

এশা: মেয়ে

সেঁজুতি খান তমা: মেয়ে

বাদ্য যন্ত্রী: সুদীপ বড়ুয়া খোকন, টারজান বড়ুয়া, পঙ্কজ বণিক, মুস্তাগিসুর রহমান বাবু, চন্দন।

পরিশিষ্ট: ২

মোরশেদুল ইসলাম পরিচালিত *চাকা* (১৯৯৩) চলচ্চিত্রের কলাকুশলী লিপি

নিবেদন: চলচ্চিত্রম ফিল্ম সোসাইটি

কাহিনি: সেলিম আল দীন-এর নাটক অবলম্বনে

চিত্রনাট্য ও পরিচালনা: মোরশেদুল ইসলাম

আবহ সংগীত: পুলক গুপ্ত

সম্পাদনা: নজরুল ইসলাম

চিত্রগ্রহণ: আনোয়ার হোসেন

প্রযোজনা: শহীদ রফিকুর রহিম

চিত্রগ্রহণ সহযোগী: লক্ষণ দাস

ব্যবস্থাপনা: গোলাম রাব্বানী বিপ্লব

প্রধান সহকারী পরিচালক: আকরাম হোসেন

গানের কথা ও সুর: আকরাম হোসেন

কণ্ঠশিল্পী: রথীন্দ্রনাথ রায়

শব্দ গ্রহণ: সৈয়দ রফিকুল আলম

অভিনয়: আমিরুল হক চৌধুরী, আশীষ খন্দকার, রুহুল আমিন রুবেল, আতাউর রহমান, দিলারা জামান, আবুল খায়ের, গোলামরসুল বাবু, বাদশা ভাই, রেহানা সুলতানা, মাহবুবা মোহসিন জয়া, মুন্নি, আরো অনেক গ্রামবাসী।

কারিগরি তথ্য

ফরম্যাট: ১৬ মি.মি.

শব্দ: অপটিক্যাল

রঙ: রঙিন (ফুজিকালার)

ভাষা: বাংলা

প্রদর্শন ব্যাপ্তি: ৬৫ মিনিট

নির্মাণকাল ১৯৯৩

স্থিরচিত্র: রতন পাল

পরিশিষ্ট: ৩

***চাকা* চলচ্চিত্রের বিভিন্ন পুরস্কার প্রাপ্তি ও অর্জন**

১. ১৯৯৩ সালে জার্মানির ম্যানহাইম চলচ্চিত্র উৎসবে আন্তর্জাতিক সমালোচক পুরস্কার (FIPRESCI) ও ইন্টার ফিল্ম জুরি পুরস্কার অর্জন।

২. ১৯৯৪ সালে ফ্রান্সের ডানকার্ক আন্তর্জাতিক চলচ্চিত্র উৎসবে শ্রেষ্ঠ চলচ্চিত্র, শ্রেষ্ঠ পরিচালক ও স্টুডেন্ট জুরির বিবেচনায় শ্রেষ্ঠ চলচ্চিত্রের পুরস্কার প্রাপ্তি।

৩. ১৯৯৫ সালে ফ্রান্সের মর্যাদাপূর্ণ জর্জেস ও রুতা সাদুল এ্যাওয়ার্ড অর্জন।

[**Abstract:** This article is committed to exploring the artistic expression, impact, and uniqueness of the play *Chaka*, written by Selim Al Deen, as it appears in two distinct art forms—stage and film. In his playwriting, Selim Al Deen gradually became more inquisitive in creating new forms of the indigenous art form. We also observe in the compositional style of *Chaka* that he remained deeply engaged in the creation of newer forms of traditional Bengali theatre reflecting his roots-orientated tendency. Inspired by the artistic theory of *Dbaitaadbaitabāda* (Dualism Non-dualism), he has integrated the indirect or direct influence of various forms, including music, poetry, stories, novels, storytelling, and the brilliance of painting, in this play. However, the core theme of the play does not directly quote myths or folklore. This play narrates the story of the shared humanity of an unrelated cartman and his companions in the burial of an unidentified corpse killed in the context of the 1990 mass uprising in Bangladesh. *Chaka* was first brought to the stage in Bangladesh by Dhaka Theatre in 1991, directed by Syed Jamil Ahmed. Later, in 1993, film director Morshedul Islam adapted it into a film of the same title, *Chaka*, based on the play. Both productions were well received in intellectual circles. Despite sharing the same central theme of the play, there are distinct differences in the artistic conception and audience impact of this theatrical production and the film. This article, applying the relevant methods of theatre and film research, is determined to present a research-based analysis of *Chaka* in both its theatrical and cinematic forms. It will present an analytical review of the dynamics, artistic style, and impact of Selim Al Deen's *Chaka* on stage and film.]